সরীসৃপ

মহাজন

গ্রামের কোনো বউ যখন বলে, তোমারই পথ চেয়েছিলাম, পথ সম্বন্ধে তখন গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বাঁধানো পাকা রাস্তা কাঁচামাটির আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ পল্লিপথে পরিণত হওয়ার উপক্রম করে। দুপাশে দেখা যায় ঝোপঝাড় ডোবাপুকুর, জীর্ণ খড় অথবা শণে ছাওয়া বাড়িঘর—একটি মেয়ের ঘোমটা ফাঁক করিয়া পথের দিকে চাহিয়া থাকিবার ফলে চারিদিকের আবহাওয়াই যেন বদলাইয়া যায়। পথটি দিয়া মোটর চালানো যায় না, পথের দুদিকে কতকটা আধুনিক ফ্যাশনের পাকা দালান খাড়া করা যায় না, যে চোখ দুটি দিয়া বউটি পথের দিকে চাহিয়াছিল (চাহিয়া ছিল কিনা ভগবান জানেন, হয়তো সমস্ত দিনটা পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইয়াছিল,—তোমার পথ চেয়েছিলাম গো !—যাকে বলিতে হয় সে যে রাত্রিটা ঘুমাইতে দিবার পাত্র নয় এটুকু জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা গ্রামের বউদেরও থাকাটা অস্বাভাবিক নয়)। সে চোখে একজোড়া চশমা আমদানি করাটাও প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

তবে বলিয়া দিলে সকলেরই বিশ্বাস করা উচিত যে, রাঙ্গা, গ্রামের বউ, প্রায় সাড়ে তিনশো মাইল লম্বা বাঁধানো রাস্তার ধারে গ্রামেরই দোতলা পাকা দালানে তার বাস, ঘুমানো দূরে থাক সারাদিন সে পাঁচ মিনিট চুপ করিয়া এক জায়গায় বসিয়াছে কিনা সন্দেহ এবং সত্যসত্যই একজনের পথের দিকে চাহিয়া থাকিয়াছে।

কখনও সদর দরজায় দাঁড়াইয়া চাহিয়াছে, কখনও জানালার শিকের ফাঁকে চাহিয়াছে, কখনও আলিসাহীন ছাদে দাঁড়াইয়া চাহিয়াছে। পথ ছাড়া আর যা কিছু দেখিবার আছে, কিছুই দেখিতে বাদ দেয় নাই। তবে সে একরকম মূল্যহীন দেখা। অনেকদিনের অতি পরিচিত আবেষ্টনী। চোখের সঙ্গে এমন অদ্ভুত ঘনিষ্ঠ পরিচয় যে, নূতনত্ব সৃষ্টিই হইতে পারে না। যে দু-একখানা নতুন ঘরবাড়ি উঠিয়াছে, যে ঘরবাড়ির সংস্কার হইয়াছে, যেখানে বন সাফ হইয়াছে, যেখানে গাছপালা নিবিড়তর হইয়াছে, যেখানে মাঠের খোলা বুক ফসলে ভরিয়া গিয়াছে, যেখানে শুকনো জমিতে জল জমিয়া আয়নার মতো ঝকঝকে জলা হইয়াছে,—তার চোখের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার জন্য কোথাও যেন আকস্মিকতা আমল পায় নাই, সমস্ত পরিবর্তনের পিছনে তার শুভদৃষ্টির অনুমোদন লাগিয়া আছে।

এই ব্যাপারটাই আগাগোড়া কেমন খাপছাড়া লাগে। প্রায় চুয়াল্লিশ বছর বয়সে এ সব কি চলে মেয়েমানুষের ! বাহিরটা ভিতরে চলিয়া আসিবে, এ বয়সে এটা আর ঠিক মানায় না, উচিত হয় না, প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। কপালে ত্রিশ বছরের সিঁদুরের ফোঁটাটা একবারও চড়চড় না করিলে যেমন অন্যায় হয়, এও কতকটা সেইরকম বইকী। সকালে, দুপুরে, বিকালে, রাত্রে, চারিপাশের জগৎকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া ভিতরে আনা, তুচ্ছতম পরিবর্তনকে পর্যন্ত সূচনা হইতে চিনিয়া রাখা। দশটা দিক তার জগতের, দশ-প্রহরণের বৈচিত্র্য। চেতনাকে অবশ করিয়া রাখা মহাপাপের শামিল নয় কী ? বিশেষত আজ যখন একজনের আসিবার কথা ছিল ? আজ যখন সে একজনের পথ চাহিয়া আছে ?

আবেগ রাঙ্গার অতি অভ্যস্ত অনুভূতি—চুয়াল্লিশ বছর বয়সে পর্যন্ত। আবেগের আতিশয্যে প্রায় প্রত্যেক দিনই কয়েকবার কিছুক্ষণের জন্য মাথা ঝিমঝিম করে। এতদিন এ জন্য বিশেষ কোনো ভাবনা ছিল না, এতবড়ো বাড়িতে এত কম লোকের মধ্যে এত কম কাজ করিয়া দিন কাটাইতে হইলে মাঝেমাঝে আবেগের আতিশয্য ঘটিয়া মাথাটা ঝিমঝিম করিলেই বরং আরাম লাগে, কিছুক্ষণের জন্য ভাবনাচিন্তা অনুভূতি সব ভোঁতা হইয়া যায়,—কিন্তু এবার কদিন আগে হঠাৎ একটা দুর্ভাবনা

গজাইয়া উঠায় বিপদ হইয়াছে, চুলে নাকি বাঙ্গার পাক ধরিয়াছে এই জন্য—এ রকম আবেগের আতিশয্য ঘটিয়া মাথা ঝিমঝিম করিতে থাকিলে কিছুদিনের মধ্যেই নাকি তার চুল পাকিয়া যাইবে। বুড়ি হইয়া পড়িবে বাঙ্গা। হায়, চুয়াল্লিশ বছর বয়স হইয়াছে বাঙ্গার, চুল পাকিয়া বাঙ্গা বুড়ি হইয়া যাইবে !

বাঙ্গা নিজেই এটা আবিষ্কার করিয়াছে। কয়েকদিন আগে করুণার বউকে সে এই বলিয়া বকুনি দিয়াছিল : বিইয়েছিস তো বাছা একটা মোটে মেয়ে, লজ্জাশরম নাইবা এর মধ্যে ভাসিয়ে দিলি ? যাক না আর দুটো দিন ? হোক না আর দুটো একটা বাচ্চাকাচ্চা ?

করুণার বউ জবাব দিয়াছিল : বেশি কাচ্চাবাচ্চা না হলে বুঝি বুড়ো বয়েস পোয্যোন্তো কনেবউটি সেজে থাকতে দিদি ?

কী বললি ?

বলিনি কিছু, জিগগেস করছি। তোমার একটিব বেশি কাচ্চাবাচ্চা হয়নি তো, মাথার চুলে পাক ধরেছে, তবু যে কনেবউটির মতো লজ্জাশরম রেখে চলেছ এটা সেই জন্য কিনা, তাই জিগগেস করছি। জিগগেস করলে তো দোষ নেই দিদি ? তোমায় জিগগেস না করলে কাকেই বা জিগগেস করব বল ?—তুমি হলে গিয়ে, কী যেন বলে, সবজান্তা।

চুলে পাক ধরিয়াছে ? ধরুক। স্বাভাবিক নিয়মে ঠিক বয়সে পাক ধরিয়া সমস্ত চুল শণের নুড়ি হইয়া যাক। কিন্তু মন কেমন করিযা মাথা ঝিমঝিমানির জন্য অসময়ে মাথার চুল সাদা হইবে কেন ? সে কি বরদাস্ত হয় মানুষের ? কে জানিত মাথা ঝিমঝিম করার এমন একটা কুফল আছে !

কপাল পোড়া, তাই অসময়ে জানিতে হইল। এতকাল না জানিয়া কাটিয়াছিল, আরও কয়েকটা দিনও না হয় কাটিত। বছরে চারটি দিনের জন্য বিধুশেখর বাড়ি আসে, তার ঠিক কয়েকটা দিন আগে এমন চাঞ্চল্যকর জ্ঞান নাই বা জুটিত। বিধুশেখর ফিরিযা যাওয়াব পর জুটিলে জ্ঞানটা নাড়াচাড়া করার সময় পাওয়া যাইত একটা বছর। এক বছরে নূতনত্ব ঘুচিয়া যাইত জ্ঞানের, আর চঞ্চল করিতে পারিত না। বছরে চারদিনের জন্য যে স্বামীকে কাছে পায়, দুর্ভাবনা দিয়া স্বামীকে অভ্যর্থনা করা তার পক্ষে মহাপাপ। অন্তত স্বামী তো একটা মারাত্মক ভুল-বোঝা বুঝিয়া ফেলিবার সুযোগ পাইবে। মনে তো করিয়া বসিবে যে বৎসরান্তে চারদিনের জন্য স্বামীকে কাছে পাইয়াও অন্যবারের মতো বউটা খুশি পর্যন্ত হয় নাই, মুখটা হাঁড়ি করিয়া আছে, তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া হয়তো ঠিক করিয়া ফেলিবে যে, এমন বউয়ের কাছে বছরে চারদিনের জন্যও আর তবে আসিযা কাজ নাই ! ব্যাস, আর আসিবে না। দিন কাটিবে মাস কাটিবে বছর কাটিবে, স্বাভাবিক অথবা অস্বাভাবিক নিয়মে বাঙ্গার চুল সাদা হইয়া আসিবে, চামড়া লোল হইয়া পড়িবে, কোমর বাঁকিয়া যাইবে,—বিধুশেখর আসিবে না। বছরে চারিদিনের জন্যও আসিবে না, একদিনের জন্যও আসিবে না। ত্রিশ বছরের নিয়মটা ভাঙিয়া যাইবে। না মরিলেও দুজনের প্রত্যেকের মনে হইবে, হয় সে নিজে, নয় অপর জন মরিয়া গিয়াছে।

পূজার সময় চারদিনের জন্য বিধুশেখর বাড়ি আসে। কবে আসে সেটা নির্দিষ্ট থাকে না, কোনো বছর পূজার দুদিন আগেই আসিয়া পড়ে, কোনো বছর পূজার মধ্যে কোনো একটা দিন আসিয়া হাজির হয়। গুনিয়া গুনিয়া চারিটি দিন যে থাকে তাও নয়। কোনোবার একদিন কমও থাকে কোনোবার একদিন বেশিও থাকে। চারিদিনের হিসাবটা বাঙ্গার ত্রিশ বছরের গড়পড়তার হিসাব—এ হিসাব বাঙ্গার একেবারে নিজস্ব। বছরে চারদিনের জন্য স্বামীকে কাছে পাইবে বাঙ্গার এই আশা, ভরসা ও বিশ্বাস—নিজের প্রাপ্য সম্বন্ধে ধারণা। বছর ভরিয়া এটা কল্পনার কাজে লাগে। বিধুশেখর একদিন কম থাক আর একদিন বেশি থাক সে জন্য কিছু আসিয়া যায় না, ওটা সাময়িক লাভলোকসানের ব্যাপার।

মোটে তিনদিন থাকবে এবার ?

এই কথাটা বলিবার সময়টুকুর মধ্যেই প্রায় বুকটার ধড়াস ধড়াস সামলাইয়া অন্ধকার পৃথিবীতে আলো আবিষ্কার কবিয়া আত্মসংবরণ করিয়া ফেলিতে পারে—নিজেব ব্যথা ভুলিয়া স্বামীকে দরদ দেখানোর কর্তব্য পালন করিতে আর স্বামীকে কাছে পাওয়ার জন্য তার যে আনন্দের সীমা নাই এই ভাবটা আবার মুখে ফুটাইয়া তুলিতে, বড়ো জোর আরও ততটুকু সময় লাগে। ব্যাস, যেমন বাঙ্গা ছিল, আবার তেমনই বাঙ্গা,—দীর্ঘ বিরহের অবসানে বুড়া বয়সেও মেয়েমানুষের যতটা আনন্দে ডগোমগো হওযা উচিত তার চেয়ে বোধ হয় বেশি ডগোমগো বাঙ্গা !

পাঁচদিন থাকবে ? সত্যি ?

বলিয়া খুশিতে ছোটো মেয়েটি বনিযা যাওয়া তো আরও সহজ ব্যাপাব আরও কম সময়েব কাজ।

এবার সপ্তমীর দিনটাও পথ চাহিয়া কাটিয়াছে। বিধুশেখর আসে নাই। অন্য বছর এটা অসাধারণ ঠেকিত না। আজ আসে নাই, কাল আসিবে। কেবল একটা দিনেব এই-আসে-এই-আসে-প্রতীক্ষাব ব্যর্থতা, পরদিন আরও বেশি অধীরতাব সঙ্গে প্রতীক্ষা। কিন্তু এবার ব্যাপারটা আগাগোড়া কেমন যেন খাপছাড়া। কোনোবার আসিবাব আগে বিধুশেখর পত্র লেখে না, এবার আগেই লিখিযা জানাইয়াছে, সপ্তমীর দিন আসিযা পৌঁছিবে। সপ্তমীর দিন না-আসাটা তাই অনন্যসাধারণ ঘটনার পর্যায়ে গিয়া পড়িয়াছে।

করুণা বলিয়াছে, আসবেন লিখে এলেন না—এ তো ভারী আশ্চর্যি, নয় বউঠান, আশ্চর্যি নয় ? দাদার বেলা তো এমন হয় না ! বাঙ্গা বলিয়াছে, কেন হবে না, হয়। ওঁর কি কথাব ঠিক আছে ? করুণার বউ ফিসফিস করিয়া বলিযাছে, কথার ঠিক আছে, মাথাব ঠিক নেই। মাথা বেঠিক বলেই না তিরিশ বচ্ছর চুল চিরে কথাব ঠিক থেকেছে।

কী বললি ?

বললাম, কোনো কাজে হযতো আটকে গেছেন কাল আসবেন।

আব এসেছে। আসবে লিখেছে যখন, আর কোনোদিন আসবে না। জীবনে কোনোদিন আসবে না বলে চলে গিযেছিল কি না, তাই প্রতি বছর এসেছে। এবাব আসবে লিখেছে কি না, আর আসবে না।

এই ক্ষুব্ধ আলোচনার জেরটা কাটিয়া যাওয়ার আগেই বিধুশেখর আসিয়া হাজিব হয়। অসময়ে, বিনা সংবাদে, একেবারে আলোচনা-সভাব মাঝখানে। আলোচনাটা তখন বাঙ্গাকে প্রায় কাঁদাইয়া ছাড়িয়াছে। অন্যবারের মতো তাই হাসিমুখে স্বামীকে অভ্যর্থনা কবিবার সুযোগটা এবার বাঙ্গার ফসকাইয়া গেল। বিধু আসিয়া দ্যাখে কী, এবার বাঙ্গার মুখের ভঙ্গিটা বড়ো খাপছাড়া, বেশভূষাটা বড়ো বেমানান। গায়ে শেমিজ থাকা দূরে থাক, পরনের কাপড়টাও ময়লা। মুখে হাসি থাকা দূরে থাক, চোখঠাসা জল। স্বামী যেন এবার বাঙ্গার আসিযাও আসে নাই।

সবচেয়ে বিপদের কথা, এবার বাঙ্গার আত্মসংযম নাই। গত বছর বাঙ্গাব বয়স ছিল প্রায় তেতাল্লিশ, কী গভীব আত্মসংযমে গত বছরও নিজেকে সে যুবতি করিয়া রাখিয়াছিল ! এবার দিদিমার মতো বুড়ি সাজিয়া অসংযমের চরম করিয়া ছাড়িল। চোখ পাকাইয়া বিধুর দিকে চাহিয়া মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল, কেন এলে আজ ? কাল আসবে লিখে আজ এলে কেন শুনি ? আরে আমাব সাতজন্মের ভালোবাসার ভাতার ! কাল আসবেন লিখে আজ এসেছেন পিরিত করতে !

এ বজ্রপাতের শামিল। হাতের সুটকেসটা মাটিতে ফেলিয়া বিধু বজ্রাহতের মতো তার উপরে বসিয়া পড়িল। একটা বজ্রপাত করিতেই বাঙ্গার সমস্ত বিদ্যুৎ খরচ হইয়া গিয়াছিল, মেয়েমানুষের বিদ্যুৎ আর জীবনশক্তি এক জিনিস, বাঙ্গাও তাই যেন হঠাৎ মরিয়া গেল। বোকার মতো জিভ কাটিয়া প্রথমে বলিল, ছি !—তারপর চারদিকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো চাহিয়া বলিল, কী বললাম ?

বিধু গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার শরীর ভালো নেই ?

চুলের প্রায় তিনভাগ সাদা বিধুর, বয়স তো গিয়াছে ষাটে। তা ছাড়া শরীরটাতে ধরিয়াছে ভাঙন। ত্রিশ বছর আগে এ রকম মুখ করিয়া এত দরদের সঙ্গে এ রকম একটা প্রশ্ন করা চলিত, এখন আর চলে না। করুণা, করুণার বউ, করুণার মেয়ে আর বাঙ্গা চারজনেরই সর্বাঙ্গে তাই রোমাঞ্চ দেখা দিল। করুণার মেয়ের কোলের আড়াই বছরের শিশুটা পর্যন্ত আবহাওয়ার মধ্যে একটা দুর্বোধ্য ভয়ানক কিছুর আবির্ভাব টের পাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

মোটের উপর অবস্থাটা দাঁড়াইয়া গেল কুৎসিত। প্রাণাধিকেব মৃতদেহটা জড়াইয়া ধরিয়া একটু বেহিসাবি রকমের বেশি সময় কাঁদাকাটা করার পর নাকে পচা গন্ধ লাগিতে আরম্ভ করিলে যেমন বীভৎস অবস্থার সৃষ্টি হয়।

যাই হোক, রবীন্দ্রকাব্যের চোলাই-খানার দেশে তামাশা করাটা সব অবস্থাতেই সোজা এবং নিরাপদ। করুণার বউ তাই মেয়ের কোল হইতে মেয়ের ক্রন্দনপরায়ণ ছেলেকে নিজের কোলে নিয়া তার হাঁ-করা মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল, বল না খোকন তোর দাদুকে, তুমি এসেছ দাদামশাই এবার দিদিমার শরীল ভালো হবে, সম্বচ্ছর কেঁদে কাটালে শরীল খারাপ হবে না একটু ?

বাঙ্গা বলিল, কী বেহায়াপানা করিস ! সম্বচ্ছর কেঁদে কাটাই না, তোব মাথা।

মুখে হাত চাপা দেওয়ায় খোকনেব ফাঁপর লাগিবার উপক্রম হইয়াছে, তবু কবুণাব বউ হাত সরাইল না। মুখ নিচু করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, আমার কাছে কি লুকোনো আছে দিদি, কত রাত কেঁদে কাটাতে দেখেছি !

তোর মাথা দেখেছিস, বেহায়া বজ্জাত মাগি ! ছেলেটাকে মারবি না কি, অ্যাঁ ?

করুণার বউয়ের কোল হইতে ছেলেটাকে বাঙ্গা ছিনাইয়া নিল। এ ঘবে আব থাকা চলে না। পাশের একটা ঘরে গিয়া বিছানায় বসিয়া নাতিকে কোলে করিয়া চুপিচুপি কাঁদিতে লাগিল। নাতির গগনভেদী আর দিদিমাব মৃদুল কান্নার সমন্বয় এ বাড়িতে একটা নূতনত্বের সৃষ্টি কবিল বইকী আজ। পূজার বাজনা শুনিতে শুনিতে মনে হইতে লাগিল, কয়েক মাইল দূরের গ্রামগুলিতে যেমন বন্যার জলে দুর্ভিক্ষের আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়া যাইবার মতো অদ্ভুত কাণ্ড ঘটাইয়া গিযাছে পূজার উৎসবটা সেই রকম মানুষের জীবনটা নিরানন্দে ভরিয়া দিতেছে।

এ ঘরের জানালা দিয়া পথ দেখা যায়। আব দেখা যায় পথের ওদিকের সাড়ে তিনটা কাঁচাপাকা বাড়ি। মাঝখানের বাড়িটার একটা ঘরের জানালা প্রায় এই জানালাটার প্রতিফলিত ছবির মতো। রাখাল দাসের ছবির মতো সেজো মেয়ে টুনুর ঘর বলিয়া জানালাটায় কেবল একটা পর্দা আছে,—তবে আধখানাই প্রায় ছেঁড়া। সকালবেলাই খবর পাওয়া গিয়াছিল আজ টুনুরও জামাই আসিয়াছে। এখন দেখা গেল, শুধু আসে নাই, সশরীরে আসিয়াছেন। বেলা বারোটার সময়েও টুনু জানালার শিক ধরিয়া দাঁড়ানো মাত্র শরীরটা অনায়াসে এবং হয়তো অকারণে তার পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে দ্বিধা করে না—টুনুর কৌতূহলেরও যেন আর ক্ষণিকের স্বাধীনতা নাই, বাহিরের জগৎকে একটু দেখিয়া লইতে জানালায় আসিলেও তাকে লজ্জা দেওয়া চাই।

অথচ টুনু সঙ্গেই যাইবে—তিনটা কি চারটা দিন পরে। ছমাস আগে হইতে ঠিক হইযা আছে, এবার টুনু সঙ্গেই যাইবে। অন্তত ছমাসের জন্য সঙ্গে যাইতেই হইবে। গন্তব্য স্থানটা এতদূর আর টুনুর বয়সটা এত কম যে ছমাস ধরিয়া টুনুর এই সঙ্গে যাওয়ার কথাটা ভাবিতে গেলেই বাঙ্গার বুক কাঁপিয়াছে, মাথার ঝিমঝিমানি বাড়িয়া গিয়াছে।

আজ এত সব কাণ্ডের ঠিক পরেই পর্দা-ছেঁড়া জানালার ফাঁকে টুনু আর নবাগতকে এক সঙ্গে দেখিয়া ফেলার ভিতরে একটা বড়ো রকমের প্রলয় ঘটিয়া গেল। বিকালেও আগের মতো হওয়া গেল না, পরদিনও গেল না।

এতদিনের সাধনা, এতদিনের অভ্যাস, ভবিষ্যতের ভাবনা কিছুই কাজে লাগিল না বাঙ্গার। বাঙ্গা কোনোমতেই স্বামীর সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক ব্যবহার করিতে পারিল না।

বিধু কতকটা নীরব গাম্ভীর্যের সঙ্গেই তার পরিবর্তনটা লক্ষ করিয়া গেল। কিন্তু সেও যে কীরকম সমস্যায় পড়িয়া গিয়াছে, প্রকাশ পাইতে বাকি থাকিল না। বিধুর দাড়িগোঁপ ভয়ানক কড়া, খুব ভালো করিয়া চাহিবার পরও হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন নিষ্ঠুরতার একটা প্রকাশ্য আবরণ। এই রকম মুখে দুর্ভাবনার সঞ্চার হওয়ায় বাঙ্গার সর্বাঙ্গ ভয়ে অবশ হইয়া আসিল। ভয়ে ভয়ে শেষ পর্যন্ত সে নিজেই কৈফিয়ত দিয়া বলিল, দ্যাখো, আমার শরীরটা সত্যি ভালো নেই। দুদিনের জন্য এলে আমি এ রকম ব্যবহার করছি বলে কিছু যেন মনে কোরো না তুমি, কেমন !

না, কিছু মনে করিনি।

এতবার এসেছ, কোনোবার আমার মুখ ভার দেখেছ ?

না, তা দেখিনি।

এবার হাসিখুশি থাকতে পাবছি না—কী যেন হয়েছে। হবে আর কী, শরীরটা ভালো নেই। এবারটি আমায় মাপ করবে না ?

এ এক ধরনের প্রেমালাপ। দিনেব বেলা ঘবের বারান্দায় সকলের চোখের সামনে বসিয়া নাতিকে কোলে করিয়া এ ধরনের গভীর ও তীব্র আবেগ-ভরা প্রেমালাপ করিতে হয়। আড়ালে চুপিচুপি ফিসফিস করিয়া এ সব প্রেমালাপ চলে না, তার মতো বেহায়াপনা আর নাই। দুজনেব বযস এখন অনেক পিছাইয়া দিলে, নাতিকে বহুদূর ভবিষ্যতে সঞ্চিত করিলে, বাঙ্গাকে টুনুর মতো হালকা ছিপছিপে একটি নববিবাহিতা মেয়ে, আর বিধুকে টুনুর জামাইয়ের মতো ফিটফাট নববিবাহিত ছেলে করিযা দিলে, দুজনের এই চমৎকার মানানসই প্রকাশ্য প্রেমালাপ যেমন অকথ্য বেহায়াপনায় দাঁড়াইয়া যায়, আড়ালে এই প্রেমালাপ তেমনই বেহায়াপনা। এমন জটিল মানুষের জীবনের এই দিকটা !

পূজা গেল। বিধু গেল না। বলিল, এই যাব আজকালেব মধ্যে। দুটো দিন থাকি।

অন্যবার এই কথায় বাঙ্গার আনন্দে পাগলামি করার কথা, এবার তার শ্রান্ত চোখ দুটি জলে ভরিয়া গেল। টুনু একজনেব সঙ্গে সেইদিন কয়েক ঘণ্টা আগে চলিয়া গিয়াছে, শুধু এ জন্য অবশ্য নয়, অন্য কারণও ছিল। প্রকৃতপক্ষে, অন্য কারণগুলিই প্রধান কারণ। সেই জন্য পাগলামি সে করিল অনেক রকম, কিন্তু আনন্দে পাগল হইতে পারিল না। কেবল টুনুর জন্য চোখে জল আসিলে সে অনায়াসে স্বামীর আরও দুটো দিন থাকিবার কথা শুনিযা মুখে হাসিকান্নার শোভা ফুটাইয়া স্বামীকে দেখাইতে পারিত। চাবির গোছাটায অসঙ্গত আওয়াজ তুলিয়া বলিতে পারিত, সত্যি আরও দুটো দিন থাকবে ? বল কী গো ! এবাব কোনদিকে সুয্যি উঠছে দেখতে হবে তো !

বিসর্জনের দশমীর পরের পূর্ণিমা আসিল, তবু বিধুশেখরের যাওয়াব লক্ষণ দেখা গেল না। বছরের পর বছর, কেবল চাবদিনের জন্য বাড়িতে আসা-যাওয়াটা রীতিমতো নাটকীয ব্যাপাব, কিন্তু বিধুশেখর আসা-যাওয়ার মধ্যে হাঙ্গামা ঢুকিতে দেয় না, যন্ত্রের মতো আসে, যন্ত্রের মতো চলিয়া যায়। যেন দৈনন্দিন সাধারণ কাজ—আপিসে যাতায়াতের মতো। এবার আসিয়াছে সে যন্ত্রের মতো, যাওয়া সম্পর্কে এ রকম বাড়াবাড়ি আরম্ভ করায় সকলে অবাক হইয়া গেল। একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল, যখন বাড়াবাড়িটা দাঁড় করাইয়া দিল অবিশ্বাস্য নাটকীয়তায়।

আরও তিনদিন বাঙ্গার চালচলন লক্ষ করিবার পর বলিল, দ্যাখো তোমায় একটা কথা বলব ভাবছিলাম। আমার সঙ্গে যাবে ?

ত্রিশ বছর পরে এ প্রশ্ন বুঝিতে সময় লাগে। বাঙ্গা কিছু বলিল না।

এবার তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাব ভাবছিলাম। বুড়ো হলাম, কবে আছি কবে নেই—

বাঙ্গা দুচোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিল, তুমি আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবে ? আমি তোমার কাছে গিয়ে থাকব ?

যদি তুমি রাজি হও। আমি ভাবছিলাম কী, কবে কী হয়েছিল সে জন্য এতকাল তুমিও কষ্ট পেলে আমিও কষ্ট পেলাম, এবার বাকি কটা দিন—

বাঙ্গার মাথা ঝিমঝিম করিতেছিল। সে সংক্ষেপে বলিল, তুমি এখনও অনেকদিন বাঁচবে।

বিধু বলিল, কি বললে ? অনেকদিন বাঁচব ? বাঁচাবাঁচির কথা পরে হবে, তুমি রাজি তো ?

রাজি নই? ওগো আমি যে সারা বছর তোমার জন্য কাঁদি আর পথের পানে চেয়ে দিন কাটাই।

গ্রাম্য মেয়ে এ ভাবে পথের পানে চাহিয়া চাহিয়া দিন কাটানোর কথা বলিলে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব না হইয়া পারে ?

বিধুশেখরের কামানো কড়া দাড়িগোঁপের নিষ্ঠুর আবরণে ঢাকা মুখ হঠাৎ এমনভাবে বিকৃত হইয়া গেল যে, দেখিলে ভয় হয়। রাগে আগুন হইয়া সে বলিতে লাগিল, সারা বছর কাঁদ ! পথের পানে চেয়ে দিন কাটাও ! এতদিন বলতে পারনি এ কথাটা ? এতকাল কাঁদতে পারনি একটু ? সারা বছর আশায় আশায় থেকে বাড়ি ফিরতাম, চৌকাটে পা দিতে না দিতে একগাল হাসি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াতে, যে কটা দিন থাকতাম, কী স্ফূর্তি, কী সব হাসিতামাশা, হইচই ব্যাপার ! কী করে জানব তুমি সারা বছর কাঁদতে ? কী করে জানব তুমি পথেব পানে চেয়ে দিন কাটাতে ? গুনতে তো জানি না আমি !

চিৎকার শুনিয়া সকলে ছুটিয়া আসিয়াছিল, ছেলে কোলে করুণার মেয়ে পর্যন্ত। কিন্তু বাঙ্গা কারও দিকে দৃষ্টিপাতও করিল না, রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, আগে জানলে আমায় নিয়ে যেতে ?

বিধুশেখর আরও রাগিয়া বলিল, যেতাম না ? নিয়ে যাবার জন্যই তো এসেছি প্রত্যেকবার। তোমার রকমসকম দেখে ভড়কে যেতাম। আমায় ছাড়া যে অমন স্ফূর্তিতে থাকতে পারে, তাকে আব সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা বলতেই সাধ হত না।

কত পাগলামিই মানুষ জানে ! এ সব কাণ্ডকারখানা দেখিলে মনে হয় না, মানুষের পক্ষে ভাবপ্রবণতা মহাপাপ, যে মানুষ হাসির পিছনে কান্না, আর কান্নার পিছনে হাসি খুঁজিয়া পায় না— ত্রিশ বছর সন্ধান করিয়াও পায় না ? বিশেষত, কয়েকজন কবি পৃথিবীর মানুষের জন্য কাব্যরস পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন এবং কাব্যরসটা সব রসের সেরা রস, এই জন্য পুরুষ মানুষের পক্ষে কবিত্ব করা আত্মহত্যার শামিল। বিধুশেখর কাব্যরস উপভোগ করিযাছিল, ভালোই করিয়াছিল— সকলেরই করা উচিত। কবি না হইয়া কবিত্ব করিতে গেল কোন হিসাবে ? কে আজ ত্রিশ বছরের ক্ষতিপূরণ করিবে ? কোন মহাজনের এত ক্ষতি সহ্য হয় ?

বন্যা

তারপর ভৈরবকে শেষরাত্রির দিকে একেবারে ঘরের চালায় উঠিতে হইল। আজ কতকাল এই শণে-ছাওয়া চালা তাকে সপরিবারে আকাশের কৃপণ অকৃপণ বর্ষণ হইতে আড়াল করিয়াছে, আকাশ-ফাটা রোদে জোগাইয়াছে ছায়া। এই চালার নীচে কত দিনরাত্রি কাটিয়াছে, কে জানিত কেবল তলায় নয়, একদিন রাত্রিশেষে দরকার হওয়া মাত্র উপরেও তার এমন আশ্রয় মিলিবে ?

ঢালু ভিজা চালা বাহিয়া একেবারে ডগায় উঠিয়া ভৈরব পা ছড়াইয়া বসিয়া রহিল। এখন বৃষ্টি নাই। আকাশের একদিকে আলগা মেঘ, অন্যদিক ফাঁকা। ফাঁকায় তারাও আছে, ছোটো একটি চাঁদও আছে। মেঘ যেন ঘষামাজা করিয়াছে আকাশকে, বৃষ্টি যেন ধুইয়া মুছিয়া দিয়াছে,—কী জ্বলজ্বলে সব তারা, কী জ্যোৎস্না বিলানোর শখ অতটুকু আনমনা ক্ষয়ধরা চাঁদের!

অথচ পৃথিবী ঝাপসা, চারিদিকে ভালো নজর চলে না। চাঁদ আর তারার আলো যেন পৃথিবীর জন্য নয়, যেটুকু পায় পৃথিবী সে শুধু উপচানো দয়া। উত্তরে আমবাগানের বন, আবছা অন্ধকারের একটা এলোমেলো স্তূপ। পশ্চিমে সেই আবছা অন্ধকারই সমতল করিয়া বিছানো,—কদিন আগে ছিল ফসল ভরা মাঠ, এখন প্রায় নিস্তরঙ্গ জলের সমুদ্র ! পূর্ব আর দক্ষিণের বাড়িগুলি নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মধ্যে বিশাল নিশ্চল আবছা অন্ধকারের ঢেউ।

সবগুলি বাড়ি নয়, মাঝে মাঝে মাচা আছে, কিন্তু খুব কাছের মাচাটি ছাড়া একটিকেও মাচা বলিয়া চেনা যায় না।

আরে হোই মহিম, আছ নাকি, হেঁই?

নিজের হাঁক শুনিয়া ভৈরবের নিজেরই চমক লাগে। এত জোরে হাঁক না দিলেও চলিত। কাছের মাচাটি হইতে মহিমের জবাব আসিবার আগে আরও দূরের সাড়া আসিল।

ভৈরব মামা, আগো ও ভৈরব মামা, একবারটি এসো ইদিকে—সর্বনাশ হইছে মোর—শুনছ ভৈরব মামা, আগো ও ভৈরব মামা !

বেশ বুঝিতে পারা যায়, আলতামণির গলা। সম্পদের আলোচনায় এমন কোমল আর মনোহারী, বিপদের আর্তনাদে এমন তীক্ষ্ণ আর মর্মভেদী গলা রাজনগরে আর কারও নাই।

কিন্তু কোনোদিক হইতে কেহ সাড়া দিল না। এমনি ভাবে রাত্রিশেষে ঘরের চালায় উঠিয়া আশ্রয় গ্রহণের আশঙ্কা থাকায় গ্রাম আগেই অর্ধেক খালি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যারা গিয়াছে তাদের বেশির ভাগ স্ত্রীলোক আর শিশু, ঘরের চালায় মাচায়, চালের বাঁশ আর গাছের ডাল হইতে দোলনার মতো ঝুলানো তক্তপোশে, অনাথদের বাড়ির পিছনের উঁচু মাটির ঢিপিটায় আর ছোটোবড়ো কয়েকটা নৌকায় যারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাদের অধিকাংশই পুরুষ। এ অবস্থায় কেউ যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে তাও মনে করা চলে না। তবু আলতামণির আর্তনাদে কেহ সাড়া দিল না।

ভৈরবের হাঁকের জবাবে মহিম বলিল, চালায় বটে নাকি ? কতক্ষণ ?

ভৈরব বলিল, এই মাত্তর উঠলাম, ভাবছিলাম চৌকির পরে রাতটুকুন কাটাব, তা শালার জল হুহু করে বাড়তে শুরু করে দিলে। দিনে দিনে ভাগ্যি সব কটাকে রেখে এলাম বনগাঁয়ে, নয়তো বিপদ ঘটত। চাল কটা নিতে এসে নিজে হলাম আটক। কানাই না-টা নিয়ে গেল বিকেলে, বলল কী, এই এলাম বলে মামা, হাটতলা যাব আর আসব। মিথ্যুক লক্ষ্মীছাড়া বাঁদরটার আর পাত্তা নেই।

আবার আলতামণির আর্তনাদ শোনা গেল, মহিমমামা ! ভৈরবমামা !—আগো শুনছ ?

ভৈরব মহিমকে বলিল, ঘরে ঘরে সমান বিপদ, আলতামণির চিল্লানিটা শুনছ ? সবার আগে মাচান হল তোর, আগে থেকে পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে বসে আছিস মাচানে উঠে, এত চ্যাঁচানি কীসের রে বাবু !

অমনি স্বভাব ছুড়ির, গাঁ-সুদ্ধু লোক দেখতে পারে না সাধে ?

মহিম বোধ হয় তামাক সাজিতে আরম্ভ করিয়াছে, আগুন দেখা গেল। একটু তামাক টানিতে পারিলে মন্দ হইত না, কিন্তু মহিমের মাচানে যাওয়ার উপায় নাই। গেলেও সুবিধা হইবে না, অতটুকু মাচানের উপর মহিমের বউ, মহিমের ছেলের বউ, দুটি বয়স্কা মেয়ে, সকলে আশ্রয় নিয়াছে। তাদেরই বোধ হয় নড়িবার ঠাঁই নাই, ওর মধ্যে কোথায় বসিয়া সে তামাক টানিবে? ডিঙি নৌকাটি অবশ্য আছে মহিমের, কিন্তু তাকে তামাক খাওয়ানোর জন্য মহিম যে মাচান হইতে নামিয়া ডিঙিতে করিয়া এখন তার চালায় আসিয়া উঠিবে সে ভরসা নাই। কোমরে দুটি বিড়ি আর দেশলাই গোঁজা ছিল, একটু হিসাব করিয়া ভৈরব একটা বিড়ি ধরাইল।

তারপর আবার শোনা গেল আলতামণির আর্ত চিৎকার,—এবার আওয়াজটা আরও তীক্ষ্ণ, আরও মর্মভেদী।

ও মহিমমামা ! ও ভৈরবমামা ! তোমাদের ভাগনি জামাই যে মরে গেল গো, একবারটি আসবে না ?

মহিম হুঁকায় একটা টান দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, যাবে নাকি ?

ভৈরব বলিল, চল যাই। হুঁকাটা এনো দাদা, বিড়িফিড়ি একদম মুখে রুচে না।

বাড়ির পিছনে সব চেয়ে মোটা আমগাছটার অনেক উঁচুতে মোটা ডাল বাছিয়া আলতামণির মাচান বাঁধা হইয়াছে। গাছটার সকলের নীচের ডালটা পর্যন্ত জল উঠিয়াছে, দেড়খানা মানুষ ডুবিয়া যাইবে। আশ্চর্যের কিছু নাই, উঁচু জমিতে উঁচু ভিটায় ভৈরবের বড়ো ঘর, চালা হইতে নামিবার সময় দেখিয়া আসিয়াছে সে ঘরের দরজার অর্ধেকের বেশি জলের নীচে ডুবিয়া গিয়াছে। ইট দিয়া তক্তপোশ উঁচু করিয়া কী সাহসেই সে ঘরের মধ্যে রাতটা কাটাইয়া দিবে ভাবিয়াছিল ! তক্তপোশটা এখন বোধ হয় ঘরের মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

এখানে আলতামণির অবস্থা সত্যই কাহিল। কাছে আসিয়া ভৈরব ও মহিম দুজনেই বুঝিতে পারিল, অকারণে আলতামণি ও রকম আর্তনাদ করে নাই। আমগাছের ডুবুডুবু ডালটা সে এক হাতে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়া আছে ; অন্য হাতে ধরিয়া আছে কানাই জীবিত না মৃত বুঝিবার উপায় নাই, কিন্তু একেবারেই নিশ্চেষ্ট, আলতামণি ছাড়িয়া দিলেই জলে ডুবিয়া স্রোতে ভাসিয়া চলিয়া যাইতে পারে, এমনিভাবে গা এলাইয়া দিয়াছে।

ধরো মামা, চট করে ধরো একজন,—হাত এলিয়ে গেছে আমার। কত্‌খন এমনি করে ধরে আছি।

মৃদু ও মধুর গলা আলতামণির, কে বলিবে একটু আগে তারই গলা দিয়া অমন ইঞ্জিনের হুইসেলের মতো আওয়াজ বাহির হইয়াছিল !

গাছের ডালে ডিঙি বাঁধিয়া দুজনে ধরাধরি করিয়া কানাইকে ডিঙিতে তুলিতেই ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝা গেল। কানাইয়ের মুখ দিয়া দেশি মদের তীব্র গন্ধ বাহির হইতেছে।

ভৈরব বলিল, বটে ! এই জন্য বাঁদরটার নায়ের দরকার হয়েছিল ! না-টা হল কী রে আলতা, অ্যাঁ ?

আলতা তখন ডালটার উপর বুক দিয়া হাঁপাইতেছে, উঠিবার ক্ষমতা নাই। ক্ষীণস্বরে বলিল, ভেসে গেছে। ভৈরব চমকাইয়া বলিল, ভেসে গেছে ! কোনদিকে গেল ? হায় সব্বোনাশ !

আলতা কাঁদিবার উপক্রম করিয়া বলিল, কোনদিকে গেল কী করে বলব মামা? আমার ইদিকে এমন সব্বোনাশ—

সব্বোনাশ ? তোর সব্বোনাশ ? আমার না গেল, সব্বোনাশ তোব ? বজ্জাতটাকে ধরলি কেন তুই, বানের জলে গাঁয়ের কলঙ্ক ধুয়ে যেত! ও ছোঁড়া যদ্দিন বাঁচবে তদ্দিন তোর সব্বোনাশ, বেটাচ্ছেলে মরলে তোব হাড় জুড়োবে।

শাপমন্যি দিয়ো না মামা—গুরুজন বটে না তুমি ?

আলতা হাঁপাইতে ভুলিযা গিয়াছে, ভৈরবের নৌকা জলে ভাসিয়া যাওযার অপরাধ ভুলিয়া গিয়াছে, নিচু গলাতেও কোমলতা নাই,—গাছের ডালে ভর দিযা এমনভাবে মুখ তুলিয়া চাহিযাছে যেন সাপের মতো ছোবল দিবে।

মহিম ভৈরবকে সাহস দিয়া বলিল, কোথাও ঠেকে থাকবে নিশ্চয়,—কাল পাত্তা মিলবে।

নৌকার শোকে কাতর ভৈরব জবাব দিল না। জলে ঢেউ নাই, কিন্তু স্রোত প্রবল। তিনজনের ভারে ডিঙ্গি নৌকাটিব এমন অবস্থা হইয়াছে যে, ঢেউ থাকিলে হয়তো ডুবিযাই যাইত। আলতামণি হাত বাডাইযা ডিঙ্গির প্রান্তটা ধবিতেই ভৈবব জোব কবিয়া তার হাত ছাড়াইযা দিল।

ডুবিয়ে মাববি নাকি সবাইকে ?

আলতামণি আবার কাঁদোকাঁদো হইয়া বলিল, অমনি করে ফেলে রাখবে নাকি ? মাচানে তোলো তবে ধবাধবি কবে ?

ডিঙির মাঝখানে একটা নির্জীব বস্তাব মতো কানাইকে ফেলিযা রাখা হইযাছে, সেখানেও জলের অভাব নাই। শবীরের হাড়গোড় থাকিলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি এ ভাবে দুমডাইয়া মুচড়াইয়া গা এলাইয়া পড়িয়া থাকা যে মানুষের পক্ষে সম্ভব কানাইকে দেখিলে বিশ্বাস হয না। তবে কানাইযের পড়িয়া থাকিবার ভঙ্গিব জন্য নয়, অতটুকু ডিঙ্গিতে এতগুলি লোকের থাকা নিবাপদ নয বলিযাই ভৈরব আর মহিম পরামর্শ করিযা কানাইকে মাচানে তুলিবাব কষ্টটা স্বীকাব কবাই স্থির কবিযা ফেলিল। এ বন্যা, আব কিছু নয়। নদীব বাঁধ কতটুকু ভাঙ্গিযাছে কে জানে, কতখানি ভাঙ্গিবে তাই বা কে জানে। এমন বন্যা আর কখনও হয নাই, এব চেয়ে ভয়ানক, এব চেয়ে সর্বনাশকারী বন্যা কল্পনা করা অসম্ভব, তবু এখনও কিছু বলা যায় না। এ বন্যা, আব কিছু নয়। হয়তো হঠাৎ প্রবল গর্জন করিতে করিতে কোথাকার আটকানো জলবাশি ছুটিয়া আসিবে। তাদেব চিহ্নও আব খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তা ছাড়া, আলতামণি কানাইকে এভাবে ডিঙ্গিতে পড়িতে থাকিতেও দিবে না, সে নিজে ডিঙ্গিতে উঠিযা আসিবেই। একজনের ডিঙ্গিতে চাবজন উঠিলে চলিবে কেন ?

মাচানে উঠিবার বাঁশের মইটা কানাই মন্দ করে নাই, গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়াছে শক্ত কবিযা। এদিক দিয়া বজ্জাতটার গুণ আছে অনেক,—যা করে ভালো করিয়াই কবে। কত তাডাতাডি মাচান বাঁধিয়াছে, হাতের কাছে যা কিছু উপাদান পাইয়াছে তাই লাগাইযাছে কাজে, তবু মাচানটি যেন দাবুণ বিপদে কদিনের জন্য নিরুপায়েব আশ্রয় নয, বন্যা উপভোগ করিবাব আরামের ব্যবস্থা। উপরে ছাউনিটা পর্যন্ত এমনভাবে করিয়াছে যেন বহুকাল রোদ বৃষ্টি ঠেকাইবার জন্য ছাউনিটাব দবকাব হইবে।

ক্ষীণ চাঁদের আবছা আলোয় বাঁশের মই বাহিযা শবেব মতো একটা নিশ্চেষ্ট শিথিল দেহ মাচানে তোলা সহজ ব্যাপার নয়। দূর সম্পর্কের দুই মামাব অকথ্য গালাগালিতে আলতামণির শ্রবণ-যন্ত্র দুটি যে একেবারে বিকল হইযা গেল না, সে এক রহস্যময় ধর্ম বটে মানুষেব ইন্দ্রিয়েব। আলতামণির আর্তনাদে সাধে কেউ সাড়া দেয় না ! তার প্রত্যেকটি আর্তনাদ শেষ পর্যন্ত এমনিভাবে মানুষকে হাঙ্গামায় ফেলে, প্রাণান্ত কবিয়া ছাড়ে। বৈশাখের প্রথমে মাঝরাত্রে সে একবাব এই রকম আর্তনাদ করিয়াছিল,—ঘরে তার আগুন লাগিয়াছে ! কেন লাগিযাছে? নদীর মোটে তিন মাইল দূরে এই গ্রামে বৈশাখ মাসে জলের জন্য মানুষের যেমন পিপাসা জাগে তীব্র, নারীবহুল এই দেশে আলতামণির জন্য কয়েকটা মানুষের তেমনি কামনা জাগিয়াছিল বলিয়া। আলতামণিকে না পাইলে আলতামণির ঘরে আগুন দিতে হয়, এমন হিংস্র সেই কামনা।

মাচাব একপাশে কানাইকে ফেলিযা দিয়া মহিম ও ভৈরব ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল। আলতামণি কানাইকে উপবে তুলিতে তাদের সাহায্য কবিতে পারে নাই, সেটা সম্ভব ছিল না। এখন তাড়াতাড়ি কানাইয়ের ভিজা কাপড় বদলাইয়া নিজের একটা শাড়ি দিয়া সে তাকে ঢাকিয়া দিল। গাছের পাতা আব মাচানের ছাউনি এখানে জ্যোৎস্নাকে আড়াল করিয়াছে,—মাচান অন্ধকার।

কী হইছে মামা ? নড়ন চড়ন নাই যে ?

ভৈরব বলিল,—কী হইছে সে তো তুই জানিস—আমরা কী করে বলব ?

মহিম বলিল,—হবে আবার কী, ঠেসে মদ গিলেছে, এখন জ্ঞান নেই।

আলতামণি কাঁদোকাঁদো গলায় বলিল, ফিবে এসে কী সব আবোল-তাবোল বকতে বকতে মই বেয়ে উঠছিল মামা, হঠাৎ কী হল পড়ে গেল নীচে। ভেসেই যেত চলে, মাচান থেকে ঝাঁপ দিযে ধরেছি। তখন চেতনা ছিল না মামা—অমন হঠাৎ চেতন লোপ পেল কেন মামা ? বড়ো ডর লাগে মামা, গা কাঁপছে মোর—হা দ্যাখো—

গা কাঁপিতেছে কিনা না দেখিয়াই তাকে ঠেলিয়া দিয়া ভৈরব বলিল, দেখেছি বাবু, দেখেছি। বকবক না করে মাথায় হাওয়া কর, আপন থেকে চেতন আসবে। বেশি গিললে অমন হয়।

হাওয়া করার কথাটা খেয়াল ছিল না, হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া আলতামণি পাখা খুঁজিয়া বাহিব করিল, তারপর কানাইয়ের মাথায় জোরে জোরে বাতাস করিতে লাগিল।

ভৈরব বলিল, আস্তে আস্তে হাওয়া কর, অত জোরে লোকে হাওয়া করে না কী ?

না মামা, জোবে জোরে করি, শিগগির চেতন হবে।

যেমন মুখ্যু তুই,—আস্তে হাওয়া দিলে বেশি কাজ দেয়। তিনবার আমায় মারলি পাখা দিযে, পাখা রাখ, আঁচল দিযে হাওয়া দে।

আলতামণি এ পরামর্শ শুনিল না, পাখা দিয়াই হাওয়া কবিতে লাগিল। তবে অধীর ব্যাকুলতাব সঙ্গে নয়, ধীরে ধীরে।

খানিক পবে মহিম বলিল, এবাব যাই আমরা ?

না মামা না, ভোরবেলা তক্ বোসো, পায়ে ধরি তোমাদেব।

ভৈবব অন্ধকাবে হাসিয়া বলিল, এত ভয়কাতুরে যদি তুই, কানাই তো কদ্দিন বাতে ঘরে থাকে না, একা থাকিস কি করে শুনি ?

আজ যে চেতন নেই মামা।

পাখাটা কানাইযের মাথায় ঠেকিয়া যাওযায় মাচানের উপর পাখাটা একবার ঠুকিয়া আলতামণি আবার বাতাস করিতে লাগিল।

তাবপর অস্ত যাওয়ার আগেই চাঁদ ঢাকিয়া গেল মেঘে, ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি হইযা যাওয়ার পর আবাব আকাশ পরিষ্কার হইয়া দু-একটা তারা ফুটিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে করিতে ভোবের আলোয় ধীবে ধীরে ম্লান হইয়া মিলাইয়া গেল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে আর কোনো বাধা রহিল না। তবে দেখিবার কিছু নাই। এ বন্যা, আর কিছু নয়। বন্যা দর্শনীয় নয়, বর্ণনীয় নয়। বুক চাপড়াইবার, মাথা কপাল ঠুকিবার যা কারণ, উপবাসে আর রোগে মরণ ঘটিবার যা কারণ, আগামী বন্যায় বুক চাপড়াইয়া মাথা কপাল ঠুকিয়া উপবাস করিয়া আর রোগে ভুগিয়া মরা পর্যন্ত রাক্ষুসে জোঁকের কাছে ঋণী থাকিবার যা কারণ, তার মধ্যে পর্যন্ত দেখিবার মতো কিছু নাই, বর্ণনা করিবার মতো কিছু নাই। চারিদিক জলে ডুবিয়া আছে, বন্যায় এই চরম দেখা। চারিদিক জলে ডুবিয়া গিয়াছে, বন্যার এই চরম বর্ণনা।

ভৈরব শেষ বিড়িটা ধরাইবে কি না ভাবিতেছিল। বিড়িটা জমাইয়া রাখিবার আর বোধ হয় দরকার নাই। মহিমের ডিঙিতে তার হারানো নৌকার খোঁজে বাহির হইলে এখানে ওখানে তামাক

কি দু-এক কলকি জুটিবে না ? আলতামণি এখনও কানাইকে সমানে বাতাস করিয়া চলিযাছে। হঠাৎ পাখা বন্ধ করিয়া ভাঙা গলায সে বলিয়া উঠিল, একবারটি দ্যাখো দিকি মামা ভালো করে তাকিয়ে ?

মহিম ও ভৈরব তাকাইয়া দেখিল। দুজনের মুখ পাংশু হইয়া গেল। এমন ধারা মুখ হল কেন মামা? শ্বাস পড়ছে না কেন মামা ? কানাইয়ের মুখ দেখিলেই সেটা বোঝা যায়। কতক্ষণ তাব শ্বাস পড়িতেছে না, তাও অনেকটা অনুমান কবা যায়।

ভৈরব ও মহিম পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। কাল অত হাঙ্গামা করিয়া মই বাহিয়া তারা কি তবে একটা শবকে মাচানে তুলিয়াছে ? ভৈরব গুরুজন হইয়া কি শাপমন্যি করিয়াছে একটা মৃত মানুষকে ?

তাই সম্ভব। মাচান হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কানাইকে আলতামণি বন্যার জলে ভাসিয়া যাইতে দেয নাই, এক হাতে আমগাছেব ডালটা আঁকড়াইয়া ধরিয়া অন্য হাতে কানাইকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, আর তীব্র মর্মভেদী আর্তনাদ আবম্ভ করিয়াছিল। তবু বন্যার স্রোত তখন কানাইকে ভাসাইযা লইয়া গিয়াছে। এ বন্যা, আর কিছু নয। বন্যা মানুষকে রেহাই দেয় না। সাবিত্রী আঁকড়াইযা ধরিযা থাকিলে পর্যন্ত বন্যা সাবিত্রীর স্বামীকে ছিনাইয়া লইয়া যাইতে পারে, সাবিত্রী বিধবা হইয়া যায।

মমতাদি

শীতের সকাল। রোদে বসে আমি স্কুলের পড়া করছি, মা কাছে বসে ফুলকপি কুটছেন। সে এসেই বলল, আপনারা রান্নার জন্য লোক রাখবেন ? আমি ছোটো ছেলেমেয়েও রাখব।

নিঃসংকোচ আবেদন। বোঝা গেল সংকোচ অনেক ছিল, প্রাণপণ চেষ্টায় অতিরিক্ত জয় করে ফেলেছে। তাই যেটুকু সংকোচ নিতান্তই থাকা উচিত তাও এর নেই।

বয়স আর কত হবে, বছর তেইশ। পরনে সেলাই করা ময়লা শাড়ি, পাড়টা বিবর্ণ লাল। সীমান্ত পর্যন্ত ঘোমটা, ঈষৎ বিশীর্ণ মুখে গাঢ় শ্রান্তির ছায়া, স্থির অচঞ্চল দুটি চোখ। কপালে একটি ক্ষতচিহ্ন—আন্দাজে পরা টিপের মতো।

মা বললেন, তুমি রাঁধুনি ?

চমকে তার মুখ লাল হল। সে চমক ও লালিমার বার্তা বোধ হয় মার হৃদয়ে পৌঁছল, কোমল স্বরে বললেন, বোসো বাছা।

সে বসল না। অনাবশ্যক জোর দিয়ে বলল, হ্যাঁ আমি রাঁধুনি। আমায় রাখবেন ? আমি রান্না ছাড়া ছোটো ছোটো কাজও করব।

মা তাকে জেরা করলেন। দেখলাম, সে ভারী চাপা। মার প্রশ্নের ছাঁকা জবাব দিল, নিজে থেকে একটি কথা বেশি কইল না। সে বলল, তার নাম মমতা। আমাদের বাড়ি থেকে খানিক দূরে জীবনময়ের গলি, গলির ভেতরে সাতাশ নম্বর বাড়ির একতলায় সে থাকে। তার স্বামী আছে আর একটি ছেলে। স্বামীর চাকরি নেই চারমাস, সংসার আর চলে না। সে তাই পর্দা ঠেলে উপার্জনের জন্য বাইরে এসেছে। এই তার প্রথম চাকরি। মাইনে ? সে তা জানে না। দুবেলা রেঁধে দিয়ে যাবে, কিন্তু খাবে না।

পনেরো টাকা মাইনে ঠিক হল। সে বোধ হয় টাকা বারো আশা করেছিল, কৃতজ্ঞতায় দুচোখ সজল হয়ে উঠল। কিন্তু সমস্তটুকু কৃতজ্ঞতা সে নীরবেই প্রকাশ করল, কথা কইল না।

মা বললেন, আচ্ছা, তুমি কাল সকাল থেকে এসো।

সে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে তৎক্ষণাৎ চলে গেল। আমি গেটের কাছে তাকে পাকড়াও করলাম।

শোন। এখুনি যাচ্ছ কেন ? রান্নাঘর দেখবে না ? আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এসো।

কাল দেখব, বলে সে এক সেকেন্ড দাঁড়াল না, আমায় তুচ্ছ করে দিয়ে চলে গেল। ওকে আমার ভালো লেগেছিল, ওর সঙ্গে ভাব করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম, তবু ! আমি ক্ষুণ্ণ হয়ে মার কাছে গেলাম। একটু বিস্মিত হয়েও। যার অমন মিষ্টি গলা, চোখে মুখে যার উপচে পড়া স্নেহ, তার ব্যবহার এমন রূঢ় !

মা বললেন, পিছনে ছুটেছিলি বুঝি ভাব করতে ? ভাবিস না, তোকে খুব ভালোবাসবে। বারবার তোর দিকে এমন করে তাকাচ্ছিল !

শুনে খুশি হলাম। রাঁধুনিপদপ্রার্থিনীর স্নেহ সেদিন অমন কাম্য মনে হয়েছিল কেন বলতে পারি না।

পরদিন সে কাজে এল। নীরবে নতমুখে কাজ করে গেল। যে বিষয়ে উপদেশে পেল পালন করল, যে বিষয়ে উপদেশ পেল না নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করল—অনর্থক প্রশ্ন

করল না, নির্দেশের অভাবে কোনো কাজ ফেলে রাখল না। সে যেন বহুদিন এ বাড়িতে কাজ করছে বিনা আড়ম্বরে এমন নিখুঁত হল তার কাজ। জল তোলা, মশলা বাটা, চাকরের কর্তব্য ; চাকরকে বারান্দায় বসে আরামে বিড়ি টানতে দেখেও সে অনুরোধ জানাল না, নিজেই জল তুলে মশলা বাটতে বসল। মার ধমক খেয়ে চাকর কাছে যাওয়া মাত্র শিল ছেড়ে উঠে গেল।

কাজের শৃঙ্খলা ও ক্ষিপ্রতা দেখে সকলে তো খুশি হলেন, মার ভবিষ্যৎ বাণী সফল করে সে যে আমায় খুব ভালোবাসবে তার কোনো লক্ষণ না দেখে আমি হলাম ক্ষুণ্ণ। দুবার খাবার জল চাইলাম, চার-পাঁচবার রান্নাঘরে গিয়ে দাঁড়ালাম, কিন্তু কিছুতেই সে আমায় ভালোবাসল না। বরং রীতিমতো উপেক্ষা করল। শুধু আমাকে নয় সকলকে। কাজগুলিকে সে আপনার করে নিল, মানুষগুলির দিকে ফিরেও তাকাল না। মার সঙ্গে মৃদুস্বরে দু-একটি দরকারি কথা বলা ছাড়া ছটা থেকে বেলা সাড়ে দশটা অবধি একবার কাশির শব্দ পর্যন্ত করল না। সে যেন ছায়াময়ী মানবী, ছায়ার মতোই ম্লানিমার ঐশ্বর্যে মহীয়সী, কিন্তু ধরা ছোঁয়ার অতীত, শব্দহীন অনুভূতিহীন নির্বিকার।

রাগ করে আমি স্কুলে চলে গেলাম। সে কী করে জানবে মাইনে করা রাঁধুনির দূরে থাকাটাই সকলে তার কাছে আশা করছে না, তার সঙ্গে কথা কইবার জন্য বাড়ির ছোটোকর্তা ছটফট করছে।

সপ্তাহখানেক নিজের নূতন অবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর সে আমার সঙ্গে ভাব করল।

বাড়িতে সেদিন কুটুম এসেছিল, সঙ্গে এসেছিল একগাদা রসগোল্লা আর সন্দেশ। প্রকাশ্য ভাগটা প্রকাশ্যে খেয়ে ভাঁড়ার ঘরে গোপন ভাগটা মুখে পুরে চলেছি, কোথা থেকে সে এসে খপ করে হাত ধরে ফেলল। রাগ করে মুখের দিকে তাকাতে সে এমন ভাবে হাসল যে লজ্জা পেলাম।

বলল, দরজার পাশ থেকে দেখছিলাম, আর কটা খাচ্ছ গুনছিলাম। যা খেয়েছ তাতেই বোধ হয় অসুখ হবে, আর খেয়ো না। কেমন ?

ভর্ৎসনা নয়, আবেদন। মার কাছে ধরা পড়লে বকুনি খেতাম এবং এক খাবলা খাবার তুলে নিয়ে ছুটে পালাতাম; এর আবেদনে হাতের খাবার ফেলে দিলাম। সে বলল, লক্ষ্মী ছেলে। এসো জল খাবে।

বাড়ির সকলে কুটুম নিয়ে অন্যত্র ব্যস্ত ছিল, জল খেয়ে আমি রান্না ঘরে আসন পেতে তার কাছে বসলাম। এতদিন তার গম্ভীর মুখই শুধু দেখেছিলাম, আজ প্রথম দেখলাম, সে নিজের মনে হাসছে।

আমি বললাম, বামুনদি—

সে চমকে হাসি বন্ধ করল। এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যেন আমি তাকে গাল দিয়েছি। বুঝতে না পেরেও অপ্রতিভ হলাম।

কী হল বামুনদি ?

সে এদিক ওদিক তাকাল। ডালে খানিকটা নুন ফেলে দিয়ে এসে হঠাৎ আমার গা ঘেঁষে বসে পড়ল। গম্ভীর মুখে বলল, আমায় বামুনদি বোলো না খোকা। শুধু দিদি বোলো। তোমার মা রাগ করবেন দিদি বললে ?

আমি মাথা নাড়লাম। সে ছোটো এক নিশ্বাস ফেলে আমাকে এত কাছে টেনে নিল যে আমার প্রথমটা ভারী লজ্জা করতে লাগল।

তারপর কিছুক্ষণ আমাদের যে গল্প চলল সে অপূর্ব কথোপকথন মনে করে লিখতে পারলে সাহিত্যে না হোক আমার কাছে সব চেয়ে মূল্যবান লেখা হয়ে উঠত।

হঠাৎ মা এলেন। সে দুহাতে আমাকে এ রকম জড়িয়েই ধরেছিল, হাত সরিয়ে ধরা-পড়া চোরের মতো হঠাৎ বিব্রত হয়ে উঠল। দুচোখে ভয় দেখা দিল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণে আমার কপালে চুম্বন করে মাকে বলল, এত কথা কইতে পারে আপনার ছেলে !

তখন বুঝিনি আজ বুঝি স্নেহে সে আমায় আদর করেনি, নিজের গর্ব প্রতিষ্ঠার লোভে। মা যদি বলতেন, খোকা উঠে আয়,—যদি কেবল মুখ কালো করে সরে যেতেন, পরদিন থেকে সে আর আসত না। পনেরো টাকার খাতিরেও না, স্বামীপুত্রের অনাহারের তাড়নাতেও না।

মা হাসলেন। বললেন, ও ওইরকম। সারাদিন বকবক করে। বেশি আশকারা দিয়ো না, জ্বালিয়ে মারবে।

বলে মা চলে গেলেন। তার দুচোখ দিয়ে দুফোঁটা দুর্বোধ্য রহস্য টপটপ করে ঝরে পড়ল। মা অপমান করলে তার চোখ হয়তো শুকনোই থাকত, সম্মানে চোখের জল ফেলল ! সে সম্মানের আগাগোড়া করুণা ও দয়া মাখা ছিল, সেটা বোধ হয় তার সইল না।

তিন-চারদিন পরে তার গালে তিনটে দাগ দেখতে পেলাম। মনে হল, আঙুলের দাগ। মাস্টারের চড় খেয়ে একদিন অবনীর গালে যে রকম দাগ হয়েছিল তেমনি। আমি ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলাম, তোমার গালে আঙুলের দাগ কেন ? কে চড় মেরেছে ?

সে চমকে গালে হাত চাপা দিয়ে বলল, দূর ! তারপব হেসে বলল, আমি নিজে মেরেছি। কাল রাত্রে গালে একটা মশা বসেছিল, খুব রেগে—

মশা মারতে গালে চড় ! বলে আমি খুব হাসলাম। সেও প্রথমটা আমার সঙ্গে হাসতে আরম্ভ করে গালে হাত ঘষতে ঘষতে আনমনা ও গম্ভীর হয়ে গেল। তার মুখ দেখে আমাবও হাসি বন্ধ হয়ে গেল। চেয়ে দেখলাম, ভাতের হাঁড়ির বুদবুদ ফাটা বাষ্পে কী দেখে যেন তার চোখ পলক হারিয়েছে, নীচের ঠোঁট দাঁতে দাঁতে কামড়ে ধরেছে, বেদনায় মুখ হয়েছে কালো।

সন্দিগ্ধ হয়ে বললাম, তুমি মিথ্যে বলেছ দিদি। তোমায় কেউ মেরেছে।

সে হঠাৎ কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, না ভাই, না। সত্যি বলছি, না। কে মারবে ?

এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে না পেয়ে আমাকে চুপ করে থাকতে হল। তখন কি জানি তার গালে চড় মারার অধিকার একজন মানুষের আঠারো আনা আছে ! কিন্তু চড় যে কেউ একজন মেরেছে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ঘুচল না। শুধু দাগ নয়, তার মুখ চোখের ভাব, তার কথাব সুর সমস্ত আমার কাছে ও কথা ঘোষণা করে দিল। বিবর্ণ গালে তিনটি রক্তবর্ণ দাগ দেখতে দেখতে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। আমি গালে হাত বুলিয়ে দিতে গেলাম, কিন্তু সে আমার হাতটা টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরল।

চুপিচুপি বলল, কারও কাছে যা পাই না, তুমি তা দেবে কেন ?

আমি অবাক হয়ে বললাম, কী দিলাম আমি ?

এ প্রশ্নের জবাব পেলাম না। হঠাৎ সে তরকারি নামাতে ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়ল। পিঁড়িতে বসামাত্র খোঁপা খুলে পিঠ ভাসিয়ে একরাশি চুল মেঝে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল, কী একটা অন্ধকার রহস্যের আড়ালে সে যেন নিজেকে লুকিয়ে ফেলল।

রহস্য বইকী। গালে চড়ের দাগ, চিরদিন যে ধৈর্যময়ী ও শান্ত তার ব্যাকুল কাতরতা, ফিসফিস করে ছোটো ছেলেকে শোনানো ; কারও কাছে যা পাই না তুমি তা দেবে কেন ? বুদ্ধির পরিমাণের তুলনায় এর চেয়ে বড়ো রহস্য আমার জীবনে কখনও দেখা দেয়নি। ভেবেচিন্তে আমি তার চুলগুলি নিয়ে বেণি পাকাবার চেষ্টা আরম্ভ দিলাম। আমার আশা পূর্ণ হল, সে মুখ ফিরিয়ে হেসে রহস্যের ঘোমটা খুলে সহজ মানুষ হয়ে গেল।

বিকালে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, তোমার বরের চাকরি হলে তুমি কী করবে ?

তুমি কী করতে বল ? হরির লুট দেব ? না, তোমায় সন্দেশ খাওয়াব ?

ধেৎ, তা বলছি না। তোমার বরের চাকরি নেই বলে আমাদের বাড়ি কাজ করছ তো, চাকরি হলে করবে না ?

সে হাসল, করব। এখন করছি যে !

তোমার বরের চাকরি হয়েছে ?

হয়েছে, বলে সে গম্ভীর হয়ে গেল।

আহা, স্বামীর চাকরি নেই বলে ভদ্রলোকের মেয়ে কষ্টে পড়েছে, পাড়ার মহিলাদের কাছে মার এই মন্তব্য শুনে মমতাদির বরের চাকরির জন্য আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠেছিলাম। তার চাকরি হয়েছে শুনে পুলকিত হয়ে মাকে সংবাদটা শুনিয়ে দিলাম।

মা তাকে ডেকে পাঠালেন, তোমার স্বামীর চাকরি হয়েছে ?

সে স্বীকার করে বলল, হয়েছে। বেশিদিন নয়, ইংরাজি মাসের পয়লা থেকে।

মা বললেন, অন্য লোক ঠিক করে দিতে পারছ না বলে কি তুমি কাজ ছেড়ে দিতে ইতস্তত করছ ? তার কোনো দরকার নেই। আমরা তোমায় আটকে রাখব না। তোমার কষ্ট দূর হয়েছে তাতে আমরাও খুব সুখী। তুমি ইচ্ছে করলে এ বেলাই কাজ ছেড়ে দিতে পার, আমাদের অসুবিধা হবে না।

তার চোখে জল এল, সে শুধু বলল, আমি কাজ করব।

মা বললেন, স্বামীর চাকরি হয়েছে তবু ?

সে বলল, তাঁর সামান্য চাকরি, তাতে কুলবে না মা। আমায় ছাড়াবেন না। আমার কাজ কি ভালো হচ্ছে না ?

মা ব্যস্ত হয়ে বললেন, অমন কথা তোমার শত্রুও বলতে পারবে না মা। সে জন্য নয়। তোমার কথা ভেবেই আমি বলছিলাম। তোমার ওপর মায়া বসেছে, তুমি চলে গেলে আমাদেরও কি ভালো লাগবে ?

সে একরকম পালিয়ে গেল। আমি তার পিছু নিলাম। রান্নাঘরে ঢুকে দেখলাম সে কাঁদছে। আমায় দেখে চোখ মুছল।

আচমকা বলল, মিথ্যে বললে কী হয় খোকা ?

মিথ্যে বললে কী হয় জানতাম। বললাম, পাপ হয়।

গুবুনিন্দা বাঁচাতে মিথ্যা বললে ?

এটা জানতাম না। গুবুনিন্দা পাপ, মিথ্যা বলা পাপ। কোনটা বেশি পাপ সে জ্ঞান আমার জন্মায়নি। কিন্তু না জানা কথা বলেও সান্ত্বনা দেওয়া চলে দেখে বললাম, তাতে একটুও পাপ হয় না। সত্যি। কাঁদছ কেন ?

তখনও তার চাকরির একমাস বোধ হয় পূর্ণ হয়নি। একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরবার সময় দেখলাম জীবনময়ের গলির মোড়ে ফেরিওয়ালার কাছে কমলালেবু কিনছে।

সঙ্গে নেবার ইচ্ছা নেই টের পেয়েও একরকম জোর করেই বাড়ি দেখতে গেলাম। দুটি লেবু কিনে আমাকে সঙ্গে নিয়ে সে গলিতে ঢুকল। বিশ্রী নোংরা গলি। কে যে ঠাট্টা করে এই যমালয়ের পথটার নাম জীবনময় লেন রেখেছিল ! গলিটা আস্ত ইট দিয়ে বাঁধানো, পায়ে পায়ে ক্ষয় হয়ে গেছে, দুদিকের বাড়ির চাপে অন্ধকার, এখানে ওখানে আবর্জনা জমা করা আর একটা দূষিত চাপা গন্ধ। আমি সংকুচিত হয়ে তার সঙ্গে চলতে লাগলাম। সে বলল, মনে হচ্ছে পাতালে চলেছ, না ?

ও কথা মনে হলেও ভদ্রতার খাতিরে অস্বীকার করলাম। সে হেসে কী বলতে গিয়ে থেমে গেল। হঠাৎ পথের ধারে ঘেঁষে দাঁড়াল।

গলি দিয়ে দু-একটি লোক চলছিল, মমতাদির সর্বাঙ্গে চোখ বোলানোতেই অভদ্রতার সীমা রেখে। একটি মাঝবয়সি খুব ফরসা লোক কিন্তু এই সীমা অতিক্রম করে গেল। মমতাদির গা ঘেঁষে যাবার সময় চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছ ?

লোকটির চেহারা ও পোশাক দুয়েরই দিব্যি জলুশ। এই গলি দিয়ে তাব হেঁটে চলা যেন গলিটাকে পরিহাস করা। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখ দেখে মনের ভাব অনুমান করার চেষ্টা করতে করতে মমতাদি বলল, আমার আত্মীয় হয়—ঠাট্টার সম্পর্ক।

সাতাশ নম্বরের বাড়িটা দোতলা নিশ্চয়, কিন্তু যত ক্ষুদ্র দোতলা হওয়া সম্ভব। সদর দরজার পরেই ছোটো একটি উঠান, মাঝামাঝি কাঠের প্রাচীর দিয়ে দুভাগ করা। নীচে ঘরের সংখ্যা বোধ হয় চার, কারণ মমতাদি আমায় যে ভাগে নিয়ে গেল সেখানে দুখানা ছোটো ছোটো কুঠবির বেশি কিছু আবিষ্কার করতে পারলাম না। ঘরের সামনে দুহাত চওড়া একটু বোয়াক, একপাশে একশিট করোগেট আয়রনের ছাদ ও চটের বেড়ার অস্থায়ী রান্নাঘর। চটগুলি কয়লাব ধোঁযায় কয়লার বর্ণ পেয়েছে।

সে আমাকে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে টুলে বসাল। ঘবে দুটি জানালা আছে এবং সম্ভবত সেই কারণেই শোবার ঘর কবে অন্য ঘরখানার চেয়ে বেশি মান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জানালা দুটির এমনই অবস্থান যে, আলো যদিও কিছু কিছু আসে, বাতাসের আসা-যাওযা একেবারে অসম্ভব। সুতরাং পক্ষপাতিত্বের যে খুব জোরালো কারণ ছিল তা বলা যায না। সংসারের সমস্ত জিনিসই প্রায এ ঘরে ঠাঁই পেয়েছে। সব কম দামি শ্রীহীন জিনিস। এই শ্রীহীনতার জন্য সযত্নে গুছিয়ে রাখা সত্ত্বেও মনে হচ্ছে বিশৃঙ্খলতার অন্ত নেই। একপাশে বড়ো চৌকি, তাতে গুটানো মলিন বিছানা। চৌকির তলে একটি চরকা আর ভাঙা বেতেব বাস্কেট চোখে পড়ে, অন্তবালে হয়তো আরও জিনিস আছে। ঘরেব এক কোণে পাশাপাশি রক্ষিত দুটি ট্রাঙ্ক—দুটিবই রং চটে গেছে, একটিব তালা ভাঙা। অন্য কোণে কয়েকটা মাজা বাসন, বাসনেব ঠিক ঊর্ধ্বে কোনাকুনি টাঙানো দড়িতে খানকয়েক কাপড়। এই দুই কোণেব মাঝামাঝি দেওযাল ঘেঁষে পাতা একটি ভাঙা টেবিল, আগাগোড়া দড়িব ব্যান্ডেজের জোরে কোনোমতে দাঁড়িয়ে আছে। টেবিলে কয়েকটা বই খাতা, একটি অল্পদামি টাইমপিস, কয়েকটা ওষুধের শিশি, একটা মেরামত করা আবশি, কয়েকটা ভাঁজ করা সংবাদপত্র, এই সব টুকিটাকি জিনিস। টেবিলের ঊর্ধ্বে দেওয়ালের গর্তেব তাকে কতকগুলি বই।

ঘরে আব একটি জিনিস ছিল—একটি বছর পাঁচেকের ছেলে। চৌকিতে শুধু মাদুবের ওপরে উপুড় হয়ে শুয়ে সে ঘুমিয়ে ছিল। মমতাদি ঘবে ঢুকেই ব্যস্ত হয়ে ছেলেটির গাযে হাত দিল, তারপব গুটানো বিছানার ভেতর থেকে লেপ আর বালিশ টেনে বাব করল। সন্তর্পণে ছেলেটির মাথাব তলে বালিশ দিযে লেপ দিয়ে গা ঢেকে দিল।

বলল, কাল সারারাত পেটের ব্যথায় নিজেও ঘুমোযনি, আমাকেও ঘুমোতে দেয়নি। উনি তো বাগ কবে—কই, তুমি লেবু খেলে না ?

আমি একটা লেবু খেলাম। সে চুপ কবে খাওয়া দেখে বলল, মুড়ি ছাড়া ঘরে কিছু নেই, দোকানের বিষও দেব না, একটা লেবু খাওয়াতে তোমাকে ডেকে আনলাম !

আমি বললাম, আর একটা লেবু খাব দিদি।

সে হেসে লেবু দিল, বলল কৃতার্থ হলাম। সবাই যদি তোমার মতো ভালোবাসত !

ঘরে আলো ও বাতাসের দীনতা ছিল। খানিক পরে সে আমায় বাইরে রোয়াকে মাদুর পেতে বসাল। কথা বলার সঙ্গে সংসারের কয়েকটা কাজও করে নিল। ঘর ঝাঁট দিল, কড়াই মাজল, জল তুলল, তারপর মশলা বাটতে বসল। হঠাৎ বলল, তুমি এবার বাড়ি যাও ভাই। তোমার খিদে পেয়েছে।

কয়েক মিনিট পরে রাজা যেন রাজধানীতে প্রবেশ করলেন এমনই ভঙ্গিতে প্রায় চল্লিশ বছর বয়সের একটি লোক বাড়ি ঢুকল। গৃহপ্রবেশের রকম দেখেই আমি তাকে চিনলাম। মমতাদির স্বামী নগেন।

যেমন রোগা তেমনই ঢ্যাঙা। এত লম্বা লোক কোনোদিন আমার চোখে পড়েনি। লম্বাও আবার এক অদ্ভুত রকমের। দেহের দীর্ঘ কাঠামোর সঙ্গে খাপ খেতে প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গও যেন লম্বাটে হয়ে গেছে। বাহু দুটি অস্বাভাবিক রকম দীর্ঘ, দুদিক চাপা ফজলি আমের মতো লম্বাটে মুখে খাঁড়ার মতো নাক, চিবুকটা ঠেলে নেমে ডগার দিকে চোখা হয়ে গেছে, মাথার চুলও মেয়েলি ধরনে বড়ো বড়ো—ঠিক বাবরি নয়। গায়ের কোটটা পর্যন্ত বালিশের ওয়াড়ের মতো সরু আর দীর্ঘ। দোর থেকে তিনবার পা ফেলেই রোয়াকে পৌঁছল। নিচু হয়ে আমার মুখের কাছে মুখ এনে নিরীক্ষণ করে বলল, তুমি কে হে ?

মুখে তামাকের দুর্গন্ধ, দাঁতগুলি কালো। আমি মুখ সরিয়ে নিয়ে বললাম, আমি সুরেশ।

সুরেশ নাকি ? বেশ দাদা বেশ। তা আমার বাড়িতে হঠাৎ সুরেশের আমদানি কী জন্য ? এ বাড়িতে সুরের রেশটুকুও যে নেই দাদা ? ওর জন্য নাকি ?

মমতাদি বলল, এ সব কী বলছ ছেলেমানুষকে ? আমি ওদের বাড়ি কাজ করি, ওকে আমি ডেকে এনেছি। ওকে ভয় দেখাচ্ছ কেন ?

নগেন চট করে সোজা হয়ে গেল, ভয় দেখাচ্ছি ? বড়ো যে লম্বা-চওড়া কথা শিখেছ ! আমি ভূত নাকি যে ভয় দেখাব ?

মমতাদি কথা না কয়ে মশলা বাটতে লাগল। নগেন লম্বা কোটের পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরাল। আচমকা নিচু হয়ে আমার মুখে ধোঁয়া ছেড়ে হ্যা হ্যা করে হাঁপানির মতো হাসল। বিড়ির কড়া ধোঁয়ায় আমি কেশে ফেললাম।

ছি ! ও কী কর ? বলে মমতাদি শিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

নগেন ফের ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো সোজা হয়ে গেল, তুমি ফোঁড়ন কাটছ কেন ? ঠোঁট দুটো বন্ধ করে রাখতে পার না ? বলে ঠোঁটে এত জোরে টোকা দিল যে ব্যথায় সে ঠোঁট কামড়ে ধরল।

বেড়ে দেখাচ্ছে তোমায় মাইরি—খাসা। বোধ হয় গালে টোকা দিলে আরও বেড়ে দেখাবে। দেব ?

মমতাদি পিছু হটল। বলল, খোকার টনিক বুঝি নিজেই গিলে এসেচ ?

আলবত। খোকা টনিক দিয়ে করবে কী ? এখনও খোকার টনিক খাওয়ার বয়স হয়নি। টনিক লাগে এই আমাদের—বলে সগর্বে নিজের বুক ঠুকে দিল। তারপর হঠাৎ মুখের জ্বলন্ত বিড়িটা আমার জামার পকেটে পুরে দিয়ে দুই কোমরে হাত রেখে সামনে পিছনে দুলে দুলে হাসতে লাগল।

মমতাদি বলল, তুমি ওর সঙ্গে অমন করছ, এর ফল কী হবে জান ?

জানি হাত দিয়ে আমার মাথাটা কচাত করে কেটে নেবে !

মমতাদি বলল, তোমার মাথার কিছু হবে না, চাকরি যাবে আমার। তুমি কী মনে কর ও বাড়ি ফিরে তোমার ব্যবহারের কথা বলে দিলে আর একদিনের জন্যও ওর মা আমাকে রাখবেন ? যা খুশি তোমার কর। কিন্তু কাজ গেলে আমায় দুষো না।

এ কথা মন্ত্রের মতো কাজ করল। নগেন মুহূর্তে দমে গিয়ে বলল, ইস ! সেটা তো খেয়াল করিনি ! আগে বলতে হয়।

তারপর মুখখানা করুণ করে বলল, তা খোকাবাবু বাড়িতে বলতে যাবে কেন ? আমি ঠাট্টা করছিলাম বই তো নয় ! ঠাট্টা শুনে রাগ করবে, বাড়িতে নালিশ করবে, খোকাবাবুকে তুমি এত বোকা ভাব নাকি ?

কী জানি। কাল চাকরি থাকবে কী যাবে দেখেই সেটা বোঝা যাবে। খোকার রাগ তুমি জান না। বলে মমতাদি ঘরে চলে গেল।

নগেন ধপ করে আমার পাশে বসে পড়ল। গলা নিচু করে বলল, চুপিচুপি না হয় তোমার পা ধরছি ভাই, রাগ রেখো না। আমি না বুঝে বড্ড দোষ করেছি। অনুতাপে এখন আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। মাইরি বলছি। কালীর দিব্যি।

তার চোখ ছলছল করতে লাগল ! আমার অবশ্য আর রাগ রইল না, কিন্তু কী বলব ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইলাম। নীরবতাকে রাগ মনে করে সে হঠাৎ নিজের কান মলে কাতর স্বরে বলল, বাড়িতে বোলো না ভাই, মরে যাব। তোমার দিদি পর্যন্ত যে উপোস করবে রে দাদা।

আমি তাড়াতাড়ি জানালাম যে রাগ করিনি, বাড়িতেও বলব না। শোনামাত্র তার সব কাতরতা দূর হয়ে গেল। অনুযোগ দিয়ে বলল, তুমি বড়ো নিষ্ঠুর ভাই ! পায়ে ধরালে কান মলালে তবে ক্ষমা করলে। তুমিই বল, শুধু ক্ষমাতে কি এখন আমার মন ওঠে ? ক্ষমার সঙ্গে একটু দয়াও করে ফ্যালো, আমার সব দুঃখ দূর হয়ে যাক। বেশি নয় ভাই, একটু দয়া। যৎসামান্য।

কী বলুন ?

বলছি। কিন্তু মনে রেখো আমার জন্য চাইছি না দয়া। তেমন পাত্র আমি নই। নিজের দুঃখের কথা আমি কাউকে বলি না। কার জন্য দয়া চাই জান ? তোমার ওই দিদির জন্য। ওর বড়ো লজ্জা, তাই মুখ ফুটে বলতে পারে না, আমাব কাছে কাঁদে আর বলে পনেরো টাকায় কুলোয় না, কি করি আমি, একদিন বিষ খেয়ে মরে যাব। মাইরি, ও কথা বলে আর হাউহাউ করে কাঁদে। সে কান্না দেখলে পাষাণেরও বুক ফেটে যায়। কালীর দিব্যি।

নগেন বলল, দু টাকা মাইনে বাড়িয়ে না দিলে তো ওকে বাঁচানো চলে না ভাই। ভয়ে মরি, দুঃখের জ্বালায় কবে সত্যি সত্যি বিষ খেয়ে ফেলে। তুমি যদি মাকে বলে ওর দু টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিতে পার তবেই সর্বরক্ষে হয়। নইলে রোজ ওর বুকফাটা কান্না আর সয় না। নগেন মাথা নাড়তে লাগল।

আমি তৎক্ষণাৎ স্বীকার করলাম মাকে বলব। কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে নগেন আচমকা আমায় সশব্দে চুম্বন করে ফেলল। আমি আঁৎকে উঠে ছিটকে সরে গেলাম। নগেন হাতজোড় করে বলল, চটো না দাদা। তোমায় বড়ো ভালোবাসি কিনা, তাই সামলাতে পারলাম না।

যুক্তকর মুক্ত করে সে ফের মুখখানা করুণ করল, কী ভাবছি জান দাদা ? ভাবছি দু টাকায কী তোমার দিদির কান্না ঘুচবে ! অভাবের সমুদ্রে দু টাকা দু ফোঁটা শিশির বই তো নয়। তুমি বরং পাঁচটা টাকার কথাই বোলো। কেমন ? তোমরা হলে রাজামানুষ, পাঁচটা টাকা তোমাদের কাছে পাঁচটা পয়সা। অ্যাঁ ?

আমি স্বীকার করলাম। নগেন বলল, ওকে বোলো না কিন্তু। ওব বড়ো লজ্জা কিনা, কেঁদে কেটে অসুখ করে ফেলবে। হয়তো লজ্জায় বিষও খেয়ে ফেলবে। জান, ওর কাছে আধ ভরি আফিং আছে।

তারপর একসময় মমতাদি বলল, চলো খোকা, আমরা যাই।

নগেন সুধাল, তুমি কোথা যাবে শুনি ?

দুবেলা যেখানে রাঁধতে যাই সেখানে, আবার কোথা ?

কী ! উনুন ধরাবে কে, ভাত চাপাবে কে ?

তুমি। আমার আজ সময় নেই।

তোর সময়ের নিকুচি করেছে ! রোজ ভাত নামিয়ে নিই তাই তোর বাবার ভাগ্যি তা জানিস? উনুন ধরা, ভাত চাপা, তারপর যেখানে খুশি মরবি যা। মমতাদি উঠানে নেমে পড়েছিল, রোয়াকে উঠল। বলল, বেশ, সব করে দিয়েই যাচ্ছি। কিন্তু কাল চাকরি গেলে আমায় মারতে উঠো না যেন !

জোঁক ফণা ধরেছিল, মুখে নুন পড়া মাত্র নরম হয়ে গেল।

চাকরি যাবে কেন ?

কেন ? বেশ ! সময়মতো কাজে না গেলে কে পয়সা দিয়ে লোক রাখে ? নটা বাজতে না বাজতে নাকেমুখে ভাত গুঁজে আপিসে ছোটো কী জন্য ? তোমার চাকরি, আমার চাকরি নয় ?

নগেন একদম কাদা হয়ে গিয়ে বলল, তোমার কাজে যাওয়ার সময় নাকি ? তবে তুমি যাও। দেরি কোরো না, চলে যাও। এদিকে যা হবার হবে।

মমতাদি হাসল, এদিকে সব হবে, তুমি ভেব না। খোকার অসুখ, আমি শিগগির ফিরে আসব।

মাস চারেক পরে আমিও বুঝলাম তার ছেলে হবে। আরও মাসখানেক সে কাজ করল, তারপর বাধ্য হয়ে আসা বন্ধ করল। দশ-বারোদিন পরে খবর নিতে গেলাম। দেখলাম রোয়াকের যে প্রান্তটা খালি ছিল সেখানে চাঁচের বেড়ার আঁতুড়ঘর নির্মিত হয়েছে। ছাদটাও চাঁচের, তবে তার ওপরে একটা ছেঁড়া শতরঞ্চি বিছানো। ছেঁড়া মলিন বিছানায় সে শুয়েছিল, পাশে একটা কাঁথা জড়ানো পুঁটলি। পুঁটলিটা চোখ বন্ধ করে ঘুমোচ্ছে, আর মাঝে মাঝে কল্পিত স্তন চুষছে।

লুব্ধ হয়ে বললাম, কোলে নেব দিদি ?

কাশিতে তার গলা ভেঙে গিয়েছিল, বিশ্রী শব্দ করে বলল, আজ নয় ভাই। ওটা আজ অস্পৃশ্য, ছুঁলে নাইতে হবে, আঁতুড় উঠুক তখন কোলে নিয়ো। সোমবারের পরে একদিন এস, কেমন ?

বৃহস্পতিবার গেলাম, কিন্তু ছেলেটাকে কোলে নিতে ঘেন্না হল। আঁতুড়ঘরটা অদৃশ্য হয়েছিল, রোয়াকে কাঁথায় শিশু শুয়েছিল। রোগা কালো, পেটটা টিমটিমে, গলায় লাল লাল ঘা। প্রথম দিন শুধু ফুলের মতো মুখখানা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম, আজ সম্পূর্ণ অবয়ব দেখে দারুণ বিতৃষ্ণা হল।

সে বলল, নেবে কোলে ?

আমি বিপদে পড়ে অনিচ্ছার সঙ্গে বললাম, দাও। ওর গলায় কী হয়েছে দিদি ?

শিশুর মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে সে বলল, কুষ্ঠ।

আমি চমকে বললাম, কুষ্ঠ ?

সে চোখ তুলে তাকাল, দু চোখে একটা অস্বাভাবিক জ্যোতি।

না ভাই, কুষ্ঠ নয়। গরম তেলে পুড়ে গেছে। কিন্তু ওকে তোমার কোলে নিয়ে কাজ নেই। ওর শরীরে অনেক ফোসকা, লাগবে।

কে গরম তেল ফেলে দিয়েছে দিদি ?

সে নীরবে চোখ মুছল, জবাব দিল না। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মমতাদি রোগা হয়ে গেছে, চোখের নীচে গভীর কালো দাগ, চোখ দিয়ে যেন দুঃখের কালি গড়িয়ে পড়ে শুকিয়েছে।

আরও তিনমাস কাটল। সে মা হবার ধাক্কা সামলে প্রায় আগের মতো সুস্থ ও সবল হয়ে উঠল, কিন্তু কাজ করতে এল না। একদিন স্কুল যাবার পথে মমতাদির ওখানে গেলাম।

নগেন আপিসে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রোয়াকে টুলে বসে পান চিবোচ্ছিল, আর গর্জন করে কী সব বলছিল। ছোটো ছেলেকে স্নান করিয়ে কাজল পরাতে পরাতে মমতাদি নির্বিকার চিত্তে শুনে যাচ্ছিল।

উঠানে উপুড় হয়ে শুয়ে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছিল মমতাদির বড়ো ছেলে পাঁচু।

আমায় দেখে নগেন গর্জন বন্ধ করে সাদরে অভ্যর্থনা করল। নিজে মমতাদির পিঁড়িটা একটানে কেড়ে নিয়ে বসে আমায় টুলে বসাল। বলল যে, আমার জন্য তার নাকি বড়োই মন কেমন করছিল। মমতাদি শুধু একটু হেসেই আমায় স্বাগত জানাল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, পাঁচু কাঁদছে কেন ?

নগেন বলল, ও শুয়ারকা বাচ্চার কথা বোলো না ভাই। হারামজাদা দু-এক বছরের মধ্যে জেলে ঢুকবে। এই বয়সে এমন পাকা চোর হয়ে উঠেছে যে, বললে তুমি বিশ্বাস করবে না। চুপ করলি পাষণ্ড ইস্টুপিড নারকী ? চুরি করে মার খেয়ে কাঁদিস, তোর লজ্জা নেই ?

আমি পাঁচুর দিকে চেয়ে দেখলাম, চোরের সাজাই হয়েছে বটে। পিঠময় অসংখ্য শাস্তির চিহ্ন, পাশে পড়ে আছে একটা ভাঙা বাকারি। নিজের চোখ-কানকে আমার বিশ্বাস হল না। মমতাদির ছেলে চোর !

বললাম, কী চুরি করেছে ?

নগেন বলল, পয়সা। খাবার নয়, খেলনা নয়, পয়সা। তাও কি আমাদের পয়সা ? ওই ওদের—বলে আঙুল দিয়ে দোতলাটা দেখিয়ে দিল। বালিশের তলা হাতড়ে পাঁচসিকে চুরি করে পালাচ্ছিল, যাদববাবু দেখতে পেয়ে চোর ছেলে ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছেন—সঙ্গে যাচ্ছেতাই গালাগালি।

আমি চকিতে মমতাদির দিকে তাকালাম। সে মাথাটা এত নিচু করেছিল যে মুখ দেখতে পেলাম না। শুধু চোখ পড়ল, তার কাগজেব মতো সাদা কপাল, আর খোকার চোখে কাজল দিতে আঙুলের থরথর কম্পন। দেহ তার নিস্পন্দ, নতমুখী মর্মর মূর্তির মতো।

যা, দূর হয়ে যা সামনে থেকে কুলাঙ্গার !

নগেনের গর্জন শুনে চমকে ফিরে চেয়ে দেখলাম, পাঁচু কখন উঠে দাঁড়িয়েছিল, এখন গুটিগুটি বাইরের দিকে চলেছে। তার সেই ধীর চলন দেখে নগেনের বোধ হয় ধৈর্যচ্যুতি হল, হাতের কাছে খড়ম ছিল এক পাটি তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল। খড়মটা পাঁচুর গায়ে লাগল না, ওদিকের দেযালে ঠেকে বৌলা ভেঙে পাঁচুর পায়ের কাছে ছিটকে এল। পাঁচু দাঁড়াল। খড়মটা তুলে নিয়ে জিভ বার করে ভেংচি কাটল। তারপর বাপের মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিয়েই চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। পিতাপুত্র দুজনেই লক্ষ্যভেদে বিশেষ অপটু দেখলাম। খড়মটা নগেনের মাথায় না লেগে শোবাব ঘরেব দরজা দিয়ে ভেতরে চলে গেল।

নগেন তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। কিন্তু উটের মতো লম্বা পা থাকা সত্ত্বেও তখনকার মতো অদৃশ্য পলাতককে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা নেই জেনে ফিরে এসে পিঁড়িতে বসে পকেট থেকে বিড়ি বার করে ধরাল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ক্রোধ-বিকৃত মুখে এমন একটা উদাসীন ভাব এনে ফেলল যে, আমি অবাক হয়ে গেলাম। বিড়ির ধোঁয়া যে রাগের এমন ভালো ওষুধ তা জানা ছিল না।

খানিক বিড়ি টেনে নগেন বলল, ঠাকুর কেমন রাঁধছে গো সুরেশবাবু ? ওর রান্নার মতো হচ্ছে ?

ঠাকুর পালিয়েছে।

নগেন সোজা হয়ে বসে ব্যগ্র কণ্ঠে বলল, সত্যি পালিয়েছে ? তবে ওকে আবার রাখ না ?

আমি সংশয়ভরে বললাম, দিদি কী আর কাজ করবে ?

দিদি মুখ তুলল। ভাবলেশহীন মুখ। ভাবের শুধু অভাব নয়, ভাবগুলি যেন মুখেই মরেছে এমনই। নীরস স্বরে বলল, না ভাই, দিদি আর কাজ করবে না।

নগেন চটে বলল, কী করবে তবে শুনি ? বসে বসে গিলবে ? যার তার বাড়ি নয়, আত্মীয়ের বাড়ির মতো। সেখানে কাজ করতে তোমার আপত্তিটা কী শুনি ? ও সব বজ্জাতি চলবে না, বুঝলে ? আমি কুড়েমির প্রশ্রয় দেব না ! কাল থেকে তুমি কাজ করতে যাবে। মাসে পনেরোটা টাকা সহজ নাকি ? এবার বরং দু টাকা বেশি হবে। হবে না খোকা ?

আমি সায় দিলাম, হবে।

মমতাদি কথা কইল না। রাগে আগুন হয়ে নগেন বলল, যাবে না তুমি ?

না।

না ? বটে ? আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করব আর তুমি বসে বসে খাবে, না ?

স্বামীর রোজগার খেলে স্ত্রী বুঝি বেয়াদব বেহায়া হয় ? ওমা, কী লজ্জা ! এমন কথা আর বোলো না, মানুষ হাসবে।

নগেন বলল, হুঁঃ, বজ্জাতি হোথা হায় ! শুনবে তবে ? শুনবে তবে ? দু পয়সা রোজগার করে স্বামীর একটু সাশ্রয় করার সুযোগ যে মেয়েমানুষ হেলা করে সে শুধু বেয়াদব নয়, সে-সে—

সে ?

সে বেশ্যা ! বলে নগেন ফের একটা বিড়ি ধরাল।

মমতাদির ধৈর্য ও সাহস দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম। খোকাকে বুকে তুলে নিয়ে সে চুমা খেল, গাল টিপে আদর করল, খোকার হাসির জবাবে হাসল, শেষে অবসরমতো বলল, তাই নাকি ? তা বেশ।

মমতাদি ঘরে চলে গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ এসে ক্রোধে মুহ্যমান স্বামীর গা ঘেঁষে বসে পড়ল। নগেন খানিকক্ষণ নিশ্চল হয়ে বসে রইল, তারপর নড়েচড়ে বারকয়েক আড়চোখে তার দিকে চেয়ে দেখল। সে সময় তার মুখখানা এমন অপূর্ব হয়ে উঠেছিল যে, আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। এটা বাইরের দৃষ্টিতে দেখেছিলাম কিংবা অন্তরের অনুভূতি দিয়ে আবিষ্কার করেছিলাম আজ সঠিক বলতে পারি না। কারণ, তার বসার ভঙ্গিটা ছিল বিচ্ছিবি—আদুরে গোপাল হ্যাংলা মেয়ের মতো, মাথাটা একদিকে কাত করে সে দুষ্টামির হাসি হাসছিল, আবার এটাও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে, সে ইচ্ছে করে লজ্জায় একেবারে অভিভূত হয়ে গেছে। নগেনকে লুব্ধ করে সে যেন কী ভিক্ষা চাইছিল। এ সবের সঙ্গে তার পূর্ব পরিচয়ের সামঞ্জস্য ছিল না, তাই সমস্ত মিলে সে আমার কাছে হয়ে উঠেছিল দুর্বোধ্য ও অপূর্ব।

আমার অস্তিত্ব সে বোধ হয় বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়ায় সরে বসতে গেল। নগেন খপ করে তার হাত ধরে ফেলল। তারপর এতক্ষণ যত রাগ জমা হয়েছিল তার সবটুকু ঝাল ঝাড়ল নির্দোষ আমাব ওপরেই !

হাঁ করে কী দেখছিস শুনি ? মজা লাগছে দেখতে, না ? বেরো আমার বাড়ি থেকে, বেরিয়ে যা !

মমতাদির চাকরির খাতিরে আমার খাতির, সে যখন চাকরিই করবে না তখন আর কীসের খাতির ! তিলেক বিলম্ব না করে আমি বেরিয়ে গেলাম। সদর দরজাটা ভেজিয়ে দেবার সময় দেখলাম মমতাদির শুভ্রশীর্ণ হাত নগেনের গলা জড়িয়ে ধরেছে।

মহাকালের জটার জট

মেজো মেয়ে সুমিত্রার বিবাহ আগামী শ্রাবণে। বড়ো মেয়ে সুচিত্রা আধবোবা, আধকালা, আধপাগল।

তাহা সত্ত্বেও পাত্র খুঁজিতে হয়। জোটে না, তবু খুঁজিতে হয়। শেষে না কাঁদিয়া মেয়ে দেওয়া যায় এমন একটি সম্বন্ধ মামার চেষ্টায় প্রায় স্থির হইয়া আসে এবং একদিন বেলা ১০টায় পাত্রপক্ষ সদলে মেয়ে দেখিতে শুভাগমন করেন।

তারপর যাহা ঘটে তাহা যেমন অচিন্ত্যনীয় তেমনই বীভৎস। অর্ধনগ্ন অবস্থায় উঠানে গড়াগড়ি দিয়া সুচিত্রা চিৎকার করিয়া কাঁদে। মবিয়া গেলেও দুবার বিবাহ সে কিছুতেই কবিবে না, এই কথা সকলকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টায় পাগল মেয়েটার যেন প্রাণ বাহির হইয়া যাওয়ার উপক্রম হয়।

যাঁহারা মেয়ে দেখিতে আসিয়াছিলেন খানিকক্ষণ মজা দেখিযা মুচকি হাসিয়া তাহারা প্রস্থান করেন। উপস্থিত সকলের মুখে মেঘ ঘনাইয়া আসে। কাহারও মুখে কথা ফোটে না, কেহ কাহারও মুখের দিকে চাহিতে পারে না। খানিক আগেই তো সুচিত্রার অনাবৃত দেহটা সকলের চোখে পড়িয়াছে। মেয়েটার অস্তিত্বে ফাঁক আছে, কিন্তু অঙ্গের কোথাও ফাঁকি নাই। ওর সম্বন্ধে এ যেন একটা নূতন চেতনা নিয়া জাগিয়া ওঠা।

সুলতা ননদকে শান্ত ও সংযত করিয়া দিতেছিল, প্রশ্নকামী মামাশ্বশুরেব নৈকট্য পবিহাব করিয়া সে এদিকে সরিয়া আসিল। সুমিত্রাকে চুপিচুপি বলিল, ওকে মিথ্যে জ্বালাতন কবা মেজো ঠাকুরঝি।

এদিকে মুখখানা ভয়ানক গম্ভীর করিয়া মামা অতিকষ্টে সুচিত্রাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দুবাব বিয়ে কী রে চিত্রা ? তোর আবার বিয়ে হল কবে ?

চোখ মুছিতে মুছিতে করুণ সুরে সুচিত্রা বলিল, হয়েছে মামা। ও রোজগার করে না বলে তোমরা আবার আমার বিয়ে দেবে ?

সে কে রে ? কার কথা বলছিস ?

সুচিত্রা নীরবে মাথা নাড়িল।

কে রোজগার করে না ? মামা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু বহু জিজ্ঞাসাবাদেও সুচিত্রাব অক্ষম স্বামীর পরিচয় জানা গেল না। সে বলিবে না। স্বামী তাহাকে বলিতে বারণ করিয়া দিয়াছে।

শেষ পর্যন্ত মামা হাল ছাড়িয়া দিলেন। একে কুমারী মেয়ে তায় আবার পাগল, ইহার মনের কথা বাহির করিবার মতো বুদ্ধি তাঁর মতো অবিবাহিত লোকের নাই। একটা বিড়ি বাহির করিয়া তিনি নীরবে ধূমপান করিতে লাগিলেন। অত চেষ্টা যত্নে জোগাড় করা সম্বন্ধ ফাঁসিয়া যাওয়ায় তাঁহার দুঃখের অবধি ছিল না।

আহা, এই পাগল মেয়েটাকে তিনি কত ভালোবাসেন ! তারই মায়ের পেটের বোনকে তিনদিন যন্ত্রণা দিয়া যমের দক্ষিণ দুয়ারের কাছাকাছি লইয়া গিয়া এ মেয়ে পৃথিবীতে আসিয়াছিল। ইহার বিবাহ দিতে পারিলে তার কত সুখ হইত শুধু ভগবানই তাহা জানেন।

ও বাড়ির যাদব মেয়ে দেখানো ব্যাপারে সহায়তা করিতে আসিয়াছিলেন, সুচিত্রার নগ্নতা চোখে পড়ামাত্র তার দৃষ্টি নিজের বাড়ির কার্নিশে উঠিয়া গিয়াছিল, এতক্ষণে চোখ নামাইয়া তিনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। সুলতার কাছে আগাইয়া গিয়া বলিলেন, এ নিশ্চয় পাগলামি ছোটোবউ।

সুলতা মৃদুস্বরে বলিল, তা ছাড়া কী ?

কাঁচাপাকা দাড়ির মধ্যে অঙ্গুলি চালনা আরম্ভ করিয়া যাদব চিন্তিতভাবে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। সুলতার কথায় যথেষ্ট আশ্বস্ত হইলেও জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা তাহাকে যেন বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। বিশ্বাস করেন না কিন্তু এ রহস্য যেন তিনি চিনেন।

সরমা পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সুলতার সঙ্গে যাদবকে কথা কহিতে দেখিয়া তার যেন চেতনা হইল। বউকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, চিত্রা এ সব কী বলছে ছোটোবউ ? তুমি কিছু জান ?

এ বাড়ির সকলকেই সুচিত্রা পরিহার করিয়া চলে কিন্তু কী কারণে বলা কঠিন। সুলতাব সঙ্গে তার ভাব আছে। এ বাড়িতে সুলতার দুপুরগুলিই বিনিদ্র। সাতমাসের ভ্রূণের ভারে তাহার পদক্ষেপ মন্থর, কিন্তু সারাটি দুপুর সে এ-ঘর ও-ঘর করিয়া বেড়ায়। চঞ্চল সে নয়, কিন্তু চুপচাপ বসিয়া থাকিতে তরুণী বধূটির যেন দারুণ অস্বস্তি।

সুচিত্রার গোপন পরিণয়ের সংবাদ যদি কাহারও জানা থাকে, তবে সুলতার থাকাই সম্ভব। কিন্তু সুলতা কিছুই জানে না।

শাশুড়ির প্রশ্নের জবাবে সে মৃদুস্বরে বলিল, জানিনে মা। ও বাড়ির পঞ্চু ছাড়া ঠাকুরঝি তো কারও সঙ্গে কথা কয় না।

শুনিয়া সরমা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। পঞ্চু ছেলেমানুষ, স্কুলে পড়ে। সরমার ছোটো ছেলেটি বাঁচিয়া থাকিলে অত বড়োই হইত এতদিনে। সুচিত্রার বিকৃত মনে এই ভাইটির জন্য কেমন করিয়া একটা আশ্চর্য প্রখর মমতা জন্মিয়াছিল, খুব সম্ভব সেই ভালোবাসাই এখন পাশের বাড়িব গম্ভীর প্রকৃতি ছেলেটির উপর পড়িয়াছে ; পাগল মেয়েব অন্ধ উগ্র ভালোবাসা। প্রকাশটি বিচিত্র। পাঁচুব স্কুল বন্ধ থাকার দিনটির প্রতীক্ষায় সুচিত্রা ছটফট করে, অন্যদিন তার কাছে পাঁচুব বেশিক্ষণ থাকা নিষেধ, তাড়াতাড়ি লেখাপড়া শিখিয়া পাঁচু মানুষ হোক সুচিত্রার এই আগ্রহ একেবারে নিষ্ঠুব। ছুটির দিন দুপুরটা পাঁচু তার কাছে থাকে। সকালে পঞ্চুর পড়া চাই, বেশ মনোযোগ দিয়া পড়া চাই, সুচিত্রাব মাথার দিব্যি।

খাওয়াদাওয়াব পব এগাবোটা কি বারোটার সময় সলজ্জভাবে পঞ্চু আসিয়া দাঁড়ানোমাত্র তাহাকে ভিতবে নিয়া গিযা সুচিত্রা ঘরে দুযার দেয়। পাঁচটা অবধি ছেলেটিকে লইয়া হাসিযা কাঁদিয়া সোহাগ করিয়াও তার যেন তৃপ্তি হয় না।

ভাঙা ভাঙা কথা তাহার এমনই দুর্বোধ্য, পঞ্চুকে সোহাগ করিবাব সময় তাহা এত বেশি জড়াইয়া যায় যে বাহির হইতে শুনিলে মানে বুঝা যায় না। কিন্তু সুরটা এমন করুণ যে চোখে জল আনিয়া দেয়।

যাদবের বড়ো ছেলে সতীশ ম্লানমুখে সরমার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, সরমাকে চোখ মুছিতে দেখিয়া সে আর আত্মসংববণ করিতে পারিল না !

মিছামিছি কেন কাঁদছেন মাসিমা ? ওর কথার কী কোনো দাম আছে ?

সতীশের চোখ ছলছল করিতে লাগিল। সরমার চোখেমুখে ব্যথা আরও ঘনীভূত হইয়া আসিল। সতীশের সহানুভূতি তার সহ্য হয় না। বুকের মধ্যে কেমন করে। সতীশ আবার বলিল, আপনার হার্ট দুর্বল, এ রকম অধীর হবেন না মাসিমা।

সরমা শ্বাস টানিয়া বলিলেন, আমার বুক ধড়ফড় করছে সতীশ।

সতীশ চমকাইয়া উঠিল, বুক ধড়ফড় করছে ! এরা দেখছি আপনাকে বাঁচতেই দেবে না মাসিমা। চলুন, আপনি একটু শুয়ে থাকবেন।

এইখানে একটু বসি, সতীশ।

সে হবে না মাসিমা, আপনাকে শুতে হবে ! সতীশ ঘরে ঢুকিয়া মাদুর ও বালিশ আনিয়া বিছাইয়া দিল। সরমা ম্লানভাবে একটু হাসিলেন। মমতায় ছেলেটা পাগল। ওর চোখের দিকে তাকাইতেও যেন ভয় করে।

হেমন্ত ছোটো ছেলে, সুলতার স্বামী। ঝড়ের মতো বাড়িতে ঢুকিয়া সে বলিল, ব্যাটাদের আচ্ছা করে গালাগালি দিয়ে এলাম, মামা। পাগল মেয়ে দেখতে এসে তার পাগলামি দেখে হাসবে, এ কী ইয়ার্কি নাকি ?

সুলতা ঘোমটা একটু টানিয়া দিল, লজ্জায় নয়, মুখের ভাব গোপন করিবার জন্য। সুমিত্রা হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ দাদা, রাস্তায় ভিড় জমেছিল ? গালাগালি শুনে পথের লোক প্রাণভরে খুব হেসেছিল ?

অযথা পরিমাণে হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িয়া হেমন্ত বলিল, না, হাসবে কেন ?

সুলতা তীব্র চাপা গলায় সুমিত্রাকে বলিল, বলো না, মেজো ঠাকুরঝি, ওঁর ভঙ্গি দেখে আমাদের সকলের হাসি পাচ্ছে, পথের লোক হাসি চেপে রাখবে কোন দুঃখে।

ও বাবা, ও কথা বলি আর বুড়ো বয়সে পিট্টি খেয়ে মরি আর কি ! বলতে হয় তুমি বল। বলিয়া সুমিত্রা মুখ বাঁকাইল। সুমিত্রার বিবাহ হয় নাই। তার বিবাহ আগামী শ্রাবণে।

সুলতা মৃদুস্বরে বলিল, বলার অধিকার আমারই পুরো বটে।

যাদব আনমনে সুলতার নিকটে সরিয়া আসিয়াছিলেন। সুলতার কথাগুলি তিনি শুনিতে পাইলেন। হেমন্তকে তাঁর কিছু বলিতে সাহস হয় না, কিন্তু সুলতার ইচ্ছা তার ভীরুতার চেয়ে বড়ো। মুখখানা যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া হেমন্তকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিলেন, এ দুর্বুদ্ধি তোমার মাথায় চাপল কেন হেমন্ত ? রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভদ্রলোককে গাল দেবার বয়স তোমার পার হয়ে গেছে বাপু।

এক মুহূর্তে ক্রুদ্ধ হইয়া উদ্ধতভাবে হেমন্ত জবাব দিল, তাই যদি গিয়ে থাকে আপনার উপদেশ শুনবার বয়সও বোধ হয় আমার পার হয়ে গেছে কাকা।

ও, আচ্ছা। বলিয়া যাদব মুখ ফিরাইয়া নিলেন। দেখিতে পাইলেন সুলতা অনভ্যস্ত দ্রুতপদে ঘরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। নিজের দাড়িকে যাদব জোরে মুচড়াইয়া দিলেন। ভাবিলেন, একালের মেয়েরা সেকালের মেয়ের মতো আছে, কিন্তু ছেলেগুলি হইয়াছে উদ্ধত, দুর্বিনীত, পাষণ্ড। ইহাদের ধরিয়া চাবকানো উচিত। ইহাদের মৃত্যু হইলে পৃথিবীর মঙ্গল।

যাদবের বুকের মধ্যে তীক্ষ্ণ ঘা লাগিল। সুলতার খুব শুভাকাঙ্ক্ষী তো তিনি ! দাড়ি আর তিনি মুচড়াইলেন না, হঠাৎ রাগের বশে যাহা ভাবিয়া বসিয়াছেন মনে মনে তাহারই জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

* * * * *

ও বাড়ির ছাদের কার্নিশে একটা চিল আসিয়া বসিয়াছে। পিঠ তাহার রোদে পুড়িয়া গেল, বুকে কিন্তু নিজের দেহেরই ছায়া।

এ বাড়ির ছাদে চিলে কুঠির ছায়ায় বসিয়া হেমন্ত আকাশে ঘুড়ি উড়াইতেছে। ঘরের জানালা দিয়া একটা সুদূর সাদা মেঘের গায়ে দুর্লক্ষ্য কালো বিন্দুর মতো স্বামীর ঘুড়িটা সুলতার চোখে পড়িল।

তাহার মুখ ম্লান হইয়া গেল। আজ সে বাপের বাড়ি যাইবে, আজিকার দিনেই ছাদে গিয়া হেমন্ত ঘুড়ি উড়াইতে বসিয়াছে এ জন্য নয়, স্বামীর এই ছেলেমানুষির পরিচয়ে তাহার চিন্তা যে জীবনের সীমা পার হইয়া স্বর্গীয় পিতার নিকট উপস্থিত হইল, ইহার আতঙ্কে। এখন এ ভাবে বাবার কথা ভাবিতে আরম্ভ করিলে বিকাল পর্যন্ত তার সময় কাটিবে কী করিয়া ?

বাবাকে সুলতা বড়ো ভালোবাসিত। সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত পিতার স্নেহের মূল্যে নিজের সমস্ত জীবনটা সে বিলাইয়া দিয়াছে, গাঢ় সুমিষ্ট মধুর তলে তার যেন আকণ্ঠ সমাধি। তুলিয়া আনা সত্ত্বেও মধুপাত্রে নিমজ্জিত মক্ষিকার মতো এখনও সে মধুর বন্ধন সর্বাঙ্গে জড়াইয়া আছে। এবং তারই ফলে অনড় অচল স্থবির তাহার জীবন, অচেনা অনাত্মীয় মানুষের মধ্যে তাই একা বাঁচিয়া থাকা।

বাবাকে মনে পড়িলে এই বৃন্তচ্যুতির অনুভূতি সুলতার অসহ্য হইয়া উঠে। মনে হয়, জীবনে পাড়ি জমাইবার জন্য ছোটো একটা ডিঙিতে তাহাকে তুলিয়া দিয়া জাহাজ নিয়া পিতা তাহার চিরদিনের জন্য নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন—এ ডিঙি সামনেও আগায় না ডুবিতেও চায় না, এ পারের তীরের কাছে অল্প ঢেউয়ে টলমল করে। বাস্তবিক, জীবন এখানে এমন অগভীর যে খেয়া ডিঙি চড়ার বালিতে ঠেকিয়া গিয়াছে বলিয়াই সুলতা সন্দেহ করে।

হেমন্তর অপরাধ নাই, তার প্রকৃতিই ওই রকম। সে যেন বয়স্ক শিশু, দায়িত্বজ্ঞানহীন নির্বোধ। ওর জন্য কতদিন লজ্জায় সুলতার মাথা কাটা গিয়াছে তার হিসাব নাই। বাড়ির সকলে যখন গম্ভীর মুখে একটা গুরুতর সাংসারিক সমস্যা নিয়া আলোচনা করে পরামর্শ দিবার জন্য ও বাড়ির যাদবকে পর্যন্ত ডাকিয়া আনা হয়, মাঝে মাঝে কী অদ্ভুত হাস্যকর মন্তব্যই হেমন্ত করিয়া বসে ! সুমতি পর্যন্ত দাদার বয়সটা অগ্রাহ্য করিয়া বলে, আবোল-তাবোল কী বকছ দাদা ?

হেমন্তর রাগ আছে ষোলো আনা।

বলে, তোর কী রে বেয়াদব মেয়ে।

তখন গুরুজনের মধ্যে কেউ ভয়ে ভয়ে বলেন, আত্মীয়স্বজনেব সুখদুঃখের কথা অমনভাবে তুচ্ছ করতে নেই হেমন্ত !

বয়ে গেল।

বয়ে গেল ? বয়ে গেল কীবে ! দাদা থাকে বিদেশে, তুই তো এখন সব দেখবি শুনবি ? তোব ওপবে তো সব ভার।

কোণঠাসা হইয়া হেমন্ত একটু মুখ বাঁকায় মাত্র, কোনো জবাব দেয় না।

আড়ালে সুলতার গা রাগে রিবি করে। ছেলের মতো যাকে শাসন কবিতে ইচ্ছা হয়, তাব স্বামিত্বের লজ্জা কোথায় লুকাইবে সে ভাবিয়া পায় না।

এ লজ্জা চিরদিনের। সিঁদুর যদি না মুছিয়া যায, পাকা চুলে তো এ কলঙ্ক ঢাকা পড়িবে না। শিশু তার কর্তা, শিশু তার ভর্তা, শিশুর সে অঙ্কশায়িনী।

সুলতা বাক্‌সো গোছানোর অসমাপ্ত কাজে ব্যাপৃত হইবার চেষ্টা করিল। দুখানা কাপড় গুছাইয়া রাখিতেই সে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। হাত গুটাইয়া সে চুপচাপ বসিয়া রহিল।

এমনই সময় আসিযা দাঁড়াইল পঞ্চু।

কী বলিতে গিযা লাজুক ছেলেটি চুপ করিয়া দাঁড়াইযা রহিল। সুলতা বলিল, কী ভাই ?

আপনি আজ চলে যাবেন ?

যাব। স্কুল পালিয়ে তুমি বুঝি আমায় তাই দেখতে এলে ?

পঞ্চু অস্বীকার করিয়া বলিল, না।

না কি ভাই ?

ক্লাসে থাকতে ভালো লাগে না তাই চলে এলাম।

সুলতা খুশি হইয়া বলিল, অন্য ছেলে বলত হ্যাঁ তোমাকে দেখতে এলাম। ছেলের দল থেকে তুমি বড়ো তফাত হয়ে গিয়েছ ভাই। কিন্তু ঠাকুরঝির জন্য স্কুল কামাই করলে, আমার জন্য পার না ?

সুচিত্রার স্নেহের মর্যাদা রাখা যেন অপরাধ এমনিভাবে পঞ্চু হাসিবার চেষ্টা করিল। সুলতা সহসা গম্ভীর হইয়া বলিল, তোমার হাসি দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে, মুখে যেন জ্যোতি নেই। খেলাধুলা কর না বুঝি ? অল্প বয়সে এত বুড়ো হয়ে গেলে, বেশি বয়সে বাঁচবে কী করে পঞ্চু ?

সরমা কতকগুলি কারুকার্যখচিত কাঁথা সেলাই করিয়া দিয়াছিলেন, সেগুলি ভাঁজ করিয়া ট্রাঙ্কে ভরিয়া সুলতা আবার বলিল, এই বয়সে তুমি বুড়ো হয়ে গেছ, আর বুড়ো বয়সে ও কত ছেলেমানুষ জানালা দিয়ে একবার তাকিয়ে দেখ ভাই। আমি আজ চলে যাব, ঘুড়ি দিয়ে উনি তাই মেঘ শিকার করছেন।

আপনি বারণ করেন না কেন ?

বারণ কবলে কে শুনছে ?

আপনাব বারণ শোনে না !

বউ বারণ কবিলে কথা শোনে না এ বকম মানুষ যে পৃথিবীতে থাকিতে পাবে পঞ্চুর এ ধারণা ছিল না। কথা না রাখিলে বউ কাঁদে, বউয়ের কান্না হেমন্ত সয় কী করিয়া ?

আপনি খুব কাঁদেন না কেন ?

ওমা কাঁদব কী জন্য ?

পঞ্চু আবও অবাক হইয়া গেল। ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝিতে পাবিতেছে না ! এমন সময় সুচিত্রাকে আসিতে দেখা গেল। সুলতা বলিল, তোমাব দিদি আসছে পঞ্চু।

ঘবে পা দিয়া কথাটা কানে যাইতেই সুচিত্রা চটিয়া উঠিল।

গেঁয়ো মেয়ের মতো কী ঠাট্টাই যে তুমি কর বউদি ! অন্য ননদ হলে গালে ঠোনা মাবত। ছি ছি, ও কথা বলতে আছে ?

সুলতা ভয়ে ভয়ে বলিল, আর বলব না ঠাকুবঝি।

সুচিত্রা এ কথা শুনিতে পাইল না। হঠাৎ তার মনে একটা নূতন খেযাল জাগিযাছে। মুখের উপর হইতে বুক্ষ চুলের রাশি সরাইয়া একাগ্রদৃষ্টিতে সে সুলতাব সিঁথির দিকে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টি দেখিয়া সুলতা দারুণ অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

অমন করে চেয়ে কী দেখছ ঠাকুরঝি ?

সুচিত্রাব যেন চমক ভাঙিল। লজ্জা ও বেদনার অপরূপ মুখভঙ্গি করিযা সে বলিল, আজ পর্যন্ত এ তো আমার মনেই পড়েনি বউদি ! দেখেছ মেয়েমানুষের মন ? কী লজ্জা, মাগো।

পঞ্চুকে বলিল, আমাব ঘরে গিয়ে একটু বসোগে যাও তো। আমি এখনই আসছি।

অত্যন্ত নির্বাধের মতো মুখ করিয়া পঞ্চু সরিয়া গেল।

সুলতাব পাশে বসিযা নালিশের সুরে সুচিত্রা বলিল, তুমিও তো এতদিন মনে করে দাওনি বউদি ?

কী মনে করে দিইনি ভাই !

নিজের সিঁথি নির্দেশ কবিয়া সুচিত্রা বলিল, সিঁদুর পরার কথা। দেখ দিকি, এই অমঙ্গলেব ধ্বজা উড়িয়ে, এয়োস্ত্রী মানুষ আমি সকলেব সামনে বার হয়েছি। তোমাদের কি চোখ নেই ?

সুলতা তাহার সিঁথি আবিষ্কার করিতে পারিল না, এলোমেলো চুলের নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। অস্তিত্বহীন কাল্পনিক স্বামীর মতো এও যেন পাগল মেয়েটার কৌতুক।

দাও বউদি আমায সিঁদুর পরিয়ে দাও।

আজ থাক ঠাকুরঝি, ভালো দিন দেখে পরো।

না, আজকেই দাও। হাতে নোয়া নেই, শাঁখা নেই, একটু সিঁদুরও পরব না ? এমন করলে ও আমায় ত্যাগ করবে। সাবা গায়ে এত অমঙ্গলের চিহ্ন কি কেউ সইতে পাবে ?

আগে চুল আঁচড়ে বেঁধে দিই, তারপর সিঁদুর পরবে। গা ধুয়ে শুদ্ধ হয়ে সিঁদুর পরতে হয় ঠাকুরঝি।

সুলতাও যেন পাগল। কুমারী মেয়ের কপালে খানিকটা লাল গুঁড়া লাগাইতে তার আপত্তির অন্ত নাই। এ বিষয়ে তার মনে উদারতার একান্ত অভাব। এয়োতির চিহ্ন নিয়া ছেলেখেলা সে ভালোবাসে না।

সুচিত্রা অধীর হইয়া বলিল, আমার অত সময় নেই বউদি। এখনই পরিয়ে দাও। বেশি বাহাদুরি তোমার না করলেও চলবে।

না দিয়া উপায় নাই। সুলতা সিঁদুরের কৌটা খুলিয়া আনিল। টিপ পরাইয়া দিতে গিয়া তাহার মনে হইল ইহার এই অর্থহীন খেয়ালটা সত্য ভাবিয়া না নিলে আর কোনোমতে চলিবে না। হিসাব করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় তার চেয়ে এই স্বামীহীন মেয়েটা স্বামী ভাগ্যে কম ভাগ্যবতী নয়। শূন্যকে ভালোবাসিয়া ইহার নালিশ নাই, বেদনা নাই, একেবারে মশগুল হইয়া আছে। জাগিয়া থাকার সময় নিজের স্বামীপ্রেমে নিজেই মুগ্ধ হইয়া থাকে, ঘুমাইয়া স্বামীর স্বপ্ন দেখে। এ ব্যাপারটা সুলতার বড়ো রহস্যজনক মনে হয়। পাগলের জাগ্রত অবস্থাটাই স্বপ্ন, স্বপ্নের অবস্থাটা কেমন ভাবিতেও পারা যায় না।

সিঁদুর পরিয়া সুচিত্রা সুলতাকে প্রণাম করিল। এক পা পিছাইয়া গিয়া সুলতা বলিল, বেঁচে থাকো ভাই, স্বামী সোহাগিনি হও।

দেখিতে দেখিতে সুচিত্রার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

সেই আশীর্বাদই কর বউদি। ও ত্যাগ করবে বলে আমার আজকাল এমন ভয় করে।

ত্যাগ করবে কেন ?

সুচিত্রা ভারী লজ্জা পাইল। এদিক ওদিক চাহিয়া ফিসফিস করিয়া বলিল, ছেলেমেয়ে হল না যে ? ও বলে নাইবা হল ছেলেমেয়ে, চাকরি করে আমি তোমায় ছেলে কিনে দেব। তাতে কিন্তু ভরসা পাই না বউদি।

সুলতার নিশ্বাস যেন আটকাইয়া আসিল।

চাকরি করে তোমায় ছেলে কিনে এনে দেবে বলেছে ?

বলেছে। কিন্তু তবু আমার ভয় করে। কেনা ছেলেকে কেউ ভালোবাসতে পারে ?

সুচিত্রা নিজের মনে মাথা চালিতে লাগিল। চোখ তুলিয়া সুলতা দেখিতে পাইল দরজার কাছে পঞ্চু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে যেন অকূলে কূল পাইল। উঠিয়া কাছে গিয়া মিনতি করিয়া বলিল, পঞ্চু ভাই, ওকে তুমি ডেকে নিয়ে যাও। ও আমাকে পাগল করে দেবে।

পঞ্চু রুক্ষস্বরে বলিল, কেন ? ও তো আপনার কোনো ক্ষতি করেনি ?

কী বলছ পঞ্চু ?

আপনার বড়ো হিংসা।

বলিয়া সুলতার উপর রাগ করিয়াই যেন কড়া সুরে পঞ্চু সুচিত্রাকে ডাকিল, এখানে বসে হচ্ছে কী ? চলে এসো।

যাই।

একান্ত অনুগতভাবে সুচিত্রা তাহার সঙ্গে চলিয়া গেল। সুলতা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হিংসাও তাহার একটু হইল বইকী। কচি লংকা চিবাইতে ঝাল যত না লাগে তেতো লাগে তার চেয়ে ঢের বেশি, পনেরো বছরের একটা অপরিপক্ক ছেলের ধমকে তার বুকের মধ্যে তেমনই অল্প অল্প জ্বালা করিতে লাগিল, সমস্ত মন তিক্ত ও বিরক্ত হইয়া উঠিল। হোক না ছেলেমানুষ, পুরুষ তো বটে—কেউটের বাচ্চা। মায়ের কোলে ওরা বিষাক্ত হইয়া উঠে। নইলে তার উপরে চোখ রাঙাইবার আত্মবিস্মৃতি মুখচোরা লাজুক ছেলেটার কেমন করিয়া হইল ?

সুলতা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, বাপের বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিয়া পঞ্চুর সঙ্গে কথা বলিবে না।

ঘরে আর থাকিতে ইচ্ছা হইল না। নিজের যাত্রার আয়োজন নিজের হাতে করা যে কী কষ্টকর সুলতা এতক্ষণে তাহা ভালো করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে।

ও বাড়ি যাওয়ার জন্য সিঁড়ি দিয়া সুলতা নীচে নামিল। বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিল সতীশ ও সুমিত্রা। সুমিত্রার দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা ভালো নয়।

প্রথমে সুমিত্রা ভয়ানক চমকিয়া উঠিল। তারপর পরম ঔদ্ধত্যের সঙ্গে অকম্পিত হস্তে একটি একটি করিয়া ব্লাউজের বোতাম লাগাইল। কোনোদিকে না চাহিয়া সে উপরে চলিয়া গেল। সতীশ মাথা নীচু করিয়া বলিল, মাসিমা কেমন আছেন জানতে এসেছিলাম বউদি।

মা ভালোই আছেন।

এ কথা অবান্তর। এ প্রশ্নোত্তরের মানে আছে, সঙ্গতি নাই।

সতীশ একটু ইতস্তত করিয়া কৈফিয়ত দিল।

ছেলেবেলা আমি সুমিত্রার বুকে একটা ফোঁড়া কাটিয়ে দিয়েছিলাম। ও অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। সেই দাগটা আজ আমায় দেখিয়েছিল।

কেন ?

দাগটা যেন ভুলে না যাই।

এমন ! এ কি তাহলে আপনার উচিত হচ্ছে ঠাকুরপো ?

সতীশ বিবর্ণ হইয়া বলিল, কী করব বলুন ? আমি নিরুপায়। আমার মনেব কী যেন একটা অসুখ আছে বউদি। সুমিত্রাকে মেয়ের মতো মনে হয়।

মেয়ের মতো মনে হয় ! আপনার মাথা খারাপ নাকি ?

সতীশ অপরাধীর মতো হাসিল।

কী জানি, হওযা আশ্চর্য নয়। কিন্তু মেয়ে মনে করলেই সুমিত্রাকে আমি খুব সুন্দরী দেখি, আর কিছু মনে করতে গেলে, ও কদর্য কুৎসিত হয়ে যায়। ও বড়ো রোগা আর বড়ো ছেলেমানুষ।

সবাই বলে সুমিত্রার মতো সুন্দরী মেয়ে দেখা যায় না। ওর মার চেয়েও সুমিত্রা সুন্দব হযেছে।

সতীশ একটু ভাবিয়া বলিল, আমার মনে হয সবাই ভুল বলে বউদি। মাসিমা যখন প্রথম এখানে আসেন, আমার বয়স ছিল নয় কি দশ। সেই বয়সে আমি যে অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকতাম এখনও মনে আছে। সারাদিন ওর আশেপাশে ঘুরতাম।

সুলতা বলিল, তা সত্যি। মাকে এখনও জগদ্ধাত্রীর মতো দেখায়। মোটা হয়ে পড়েছেন নইলে—

সতীশ বাধা দিয়া বলিল, ওইটুকু মোটা না হলে ওকে মানাত না বউদি।

তা হয়তো মানাত না, কিন্তু বয়স আন্দাজে সুমিত্রা তো রোগা নয়। দিব্যি ছিপছিপে গড়ন।

সতীশ হাসিয়া বলিল, ননদ কিনা, ওর সবই আপনার ভালো লাগে। কীরকম হাবলা দেখলেন তো ? বারবার বললাম, দাগের কথা আমার মনে আছে সুমিত্রা, দেখাবার কোনো দরকার নেই, কথা শুনল না। বলিয়া সতীশ গম্ভীর হইয়া গেল, ওষ্ঠের প্রান্ত ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, বাপের জন্য সুমিত্রা দেখতে খারাপ হয়েছে।

তিনি বুঝি দেখতে ভালো ছিলেন না ?

সতীশ সজোরে মাথা নাড়িল, বিশ্রী। নাক বোঁচা, চোখ ছোটো, রং কালো—দেখে আমার হাসি পেত। আফিস থেকে এলে কেন যে ছুটে কাছে যেতেন ভেবে আমি অবাক হয়ে যেতাম। একদিন কি মজা হয়েছিল শুনুন—

বিবর্ণ মুখে সুলতা শুনিল। হেমন্তের সঙ্গে সতীশ উঠানে ক্রিকেট খেলিতেছিল। আপিস ফেরত হেমন্তের বাবা বারান্দায় বসিয়া জিরাইতেছিলেন, তাহাকে বাতাস করিতেছিলেন সরমা। হঠাৎ বল লাগিয়া হেমন্তের বাবার ঠোঁট কাটিয়া একেবারে রক্তারক্তি ব্যাপার।

রুদ্ধ নিশ্বাসে সুলতা জিজ্ঞাসা করিল, ইচ্ছে করে মেরেছিলেন নাকি ?

সতীশ উদাসভাবে বলিল, কি জানি, মনে নেই। কিন্তু মরে যাবেন ভয়ে সারাদিন বুকের মধ্যে কেমন করেছিল, বেশ মনে আছে।

ভয়ে ?

প্রশ্ন শুনিয়া সতীশ চটিয়া উঠিল, তবে কি ? কী বলতে চান শুনি ? ভয়ে নয়তো কীসে বুক কেঁপেছিল ?

আমি কিছুই বলতে চাই না, ঠাকুরপো।

সতীশ কথঞ্চিৎ ঠান্ডা হইয়া বলিল, মাসিমা সে জন্য আমায় কিন্তু শাস্তি দিতে ছাড়েননি, কান মলে দিয়েছিলেন। মনে পড়লে এখনও সে জন্য কান লাল হয়ে ওঠে : মাসিমার উপর অভিমান করতে ইচ্ছা হয়।

সুলতা আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। যে সব কথা তাহার মনে হইতে লাগিল, সতীশের সামনে দাঁড়াইয়া ভাবিতে গেলে যে মূর্ছিতা হইয়া পড়িবে।

দ্রুতপদে সে উঠান পার হইয়া গেল।

মনোরমার কাছে পৌঁছিবার পূর্বে দেখা হইল যাদবের সঙ্গে।

সুলতার কুঞ্চিত ভ্রু-দুটি সরল হইয়া উঠিল, মুখের ক্লিষ্টভাব মিলাইয়া গেল ! তার মনে হইল, আজ সারাদিন সকল কাজের ফাঁকে সকল দুশ্চিন্তার আড়ালে ইহার সঙ্গই সে কামনা করিয়াছে। যে শূন্যতা সারাদিন তাহাকে আজ পীড়ন করিয়াছে, ইহার সহিত কথা কহিবার সুযোগ পাওয়ামাত্র তাহা ভরাট হইয়া গেল।

আপনার অম্বল হয়েছে শুনলাম, এখন কমেছে ?

যাদবের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় এই প্রশ্ন তাহার হাঁপ ছাড়ার মতো শোনাইল। তাহা লক্ষ না করিয়াই যাদব বলিলেন, অম্বল কমেছে। তুমি বুঝি মনোর খবর নিতে এলে ছোটোবউ ? ওর কান্নাও আজ কমেছে।

এ সুখবর কাকা। মনো বড়ো বেশি কাঁদত।

যাদব বলিলেন, ওটা দুর্বল মনের লক্ষণ। মনের জোর না থাকলে আনন্দ যেমন পঙ্গু হয়, শোক দুঃখের তেমনই হয় বাড়াবাড়ি। একমাসের ছেলের মরণ ছোঁয়াচে নয়, ও যে কেঁদে কেঁদে মরতে বসেছে সে রোগ ওর নিজের। ওর মনে আত্মনির্যাতনের প্রবৃত্তি আছে, মরণের প্রেরণা আছে। ছেলে মরার উপলক্ষটা ও কামনা করেছিল কি না কে জানে।

মেয়ের মর্মান্তিক বেদনা সম্বন্ধে যাদবের এই ভয়ানক মন্তব্যে সুলতা প্রীতিবোধ করিল। মেয়ের কান্নাকাটিতে যাদবের বিরক্তি যেন তারই ব্যক্তিগত লাভ। তবু অবিশ্বাসের ভান করিয়া মৃদু হাসির সঙ্গে সে বলিল, কী যে বলেন তার ঠিক নেই। অমন কামনা কেউ করে ?

করে না ? তুমি কিছুই জান না ছোটোবউ। যাদব একপ্রকার অদ্ভুত হাসি হাসিলেন। মনে হইল, তাহার বাক্-সংযম আজ একেবারেই মুছিয়া গিয়াছে। জীবনের সর্বাপেক্ষা নিভৃত সর্বাপেক্ষা বীভৎস, সত্যের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া তরুণী বধূটিকে তিনি আজ ভীতা করিয়া তুলিতে চান।

বলিলেন, জীবনের এদিকটা তোমার কাছে অন্ধকার ছোটোবউ । বৈধব্যের রোমান্সের জন্য সব মেয়েই যে মনে মনে স্বামীর মৃত্যু কামনা করে এটা বিশ্বাস করা তোমার পক্ষে কঠিন।

সুলতার অভিজ্ঞতা কম নয়। চোখ নামাইয়া সংক্ষেপে সে শুধু বলিল, কঠিন নয়, বোধ হয় কষ্টকর।

তার চোখ দিয়া দু ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। যাদব তাহা দেখিতে পাইলেন। তাঁহার আঙুলগুলি কাঁপিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ তিনি কাঁচাপাকা দাড়ির মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

দেখিয়া সুলতার মনে হইল আত্মসংযমের এই অতুলনীয় প্রসঙ্গের সঙ্গে তার যেন জন্মজন্মান্তরের পরিচয়। একটা অবাস্তব কল্পনায় নিজের জীবনকে রূপকের রূপ দিয়া যাদবের পায়ে বিদায়ের প্রণামটা এখনই সারিয়া নিবার জন্য তার মন উন্মুখ হইয়া উঠিল। আকাশগঙ্গার মতো শূন্য বাহিয়া ঝরিতে ঝরিতে এমনই একটি প্রাচীন মহাকালের জটায় একটি সুদীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন বিশ্রামের কয়েক মুহূর্তব্যাপী সংক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র অভিনয়।

যাদব বলিলেন, মনোর সঙ্গে দেখা করে এসো। আমি আমার ঘরে রইলাম।

মনোরমার সংবাদ কিছুই অসাধারণ নয়। কাঁদিতে গিয়া আজ চোখ এত জ্বালা করিয়াছে যে বারবার কলের জলে চোখ ধুইয়া সে চুপচাপ বিছানায় বসিয়াছিল।

কয়েকদিনের শোকেই শীর্ণ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। স্বাভাবিক সুরে কথা বলিবার চেষ্টা আজই বোধ হয় তাহার প্রথম।

বুকটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে ভাই। এত জল খেয়েছি তা বলবার নয় তবু তেষ্টা মিটছে না। এমন ঘুমেও ধরেছে আজ, সারাদিন কেবল ঢুলেছি।

সুলতা সায় দিয়া বলিল, শরীরের ওপরে অত্যাচার তো কম হয়নি।

না, তা হয়নি। মনোরমা একটা রঙিন উলের টুপি হাতে তুলিয়া নিল। উদাসভাবে বলিল, কিন্তু তা ছাড়া আমার বাঁচবার উপায় ছিল না ভাই। বুক ফেটে মরে যেতাম। খোকা তো শুধু আমার ছেলে হয়ে আসেনি ; ওর মধ্যে আমি বন্ধু পেয়েছিলাম, সাথী পেয়েছিলাম, প্রেমিক পেয়েছিলাম ! বিয়ের পর উনি যেমন নিরাশ্রয় প্রেম নিয়ে ভয়ে বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতেন তেমনইভাবে তাকাতে শিখেছিল। খোকা কাঁদলে আমার মনে হত আমাকে জয় করবার চেষ্টায় উনি আবার মুখর হয়ে উঠেছেন। খোকার হাত গালে ঠেকলে ওঁর প্রথম দিনের স্পর্শ আমাব মনে পড়ে যেত, রোমাঞ্চ হয়ে আমার সমস্ত শরীর ঘুমিয়ে পড়ত ভাই।

সুলতা নীরবে শুনিয়া গেল। তাহার মনে হইল এমনি ভাবেই সকলে নিজের আনন্দ ও বেদনাকে স্বতন্ত্র ও মৌলিক মনে করিয়া থাকে বটে। সে ছাড়া আর কোনো নারী যে কোনোকালে সন্তানকে স্বামীর প্রতিনিধি করিয়া ভালোবাসার অরাজক রাজ্যে শৃঙ্খলা আনিবার চেষ্টা করিয়াছে মনোরমা তাহা ভাবিতেও পারে না।

প্রথম পুত্রের মৃত্যু যে স্বামীপুত্র দুজনকে একসঙ্গে হারানোর মতো অসহ্য পৃথিবীতে মনোরমাই তাহা প্রথম জানিল।

শোকদুঃখের আগাগোড়ায় এ বেদনা তাই চিরস্থায়ী। ত্রিশ বছর পরে স্বামীর যৌবনকালের ফটো দেখিয়া মনোরমাব মনের ভিতর হুহু করিয়া উঠিবে, মনে হইবে, এমনই মুখ, এমনই অতুল অতৃপ্ত হাসি নিয়া যে আজ তাহার নিজস্ব হইয়া থাকিত, সে গেল কোথায় ?

পুত্রবধূর মধ্যে পুনর্জন্ম নিতে সে কেন পারিল না, হায় ভগবান !

সুলতার চমক ভাঙিল। বালিশে মুখ গুঁজিয়া মনোরমা আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যাদবের কাছে শেষ বিদায় নেওয়া হয় না। এ কান্নার ছোঁয়াচ মনে লাগাতে সুলতা সাহস পাইল না। এক পা এক পা করিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

যাদব বলিলেন, কাল থেকে দুর্ভাবনা শুরু হবে ছোটোবউ।

আমি চলে যাব বলে ?

যাদব বিচলিতভাবে বলিলেন, আমাব বাড়ি যদি তোমার বাড়ি হত ! তিন কাল অশান্তিতে কাটল, শেষের এই মহাকালটাও কি আমার তেমনই অশান্তিতে কাটবে ? জীবনে একবার জট পাকালে আর ইতি নেই, ক্ষমা নেই।

শেষবেলায় আজ জোর বাতাস উঠিয়াছে। যাদবের দাড়িতে চাঞ্চল্য দেখা দেয়, একটা ক্যালেন্ডার পাখির পাখার মতো দেওয়ালে ঝাপটা মারে। সুলতার চোখ মিটমিট করিতে থাকে। যাদবের কোলে ন্যাকড়া জড়ানো যে ঝাপসা শিশুটি হাত-পা নাড়িয়া খেলা করে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে আশঙ্কায় সুলতা ভালো করিয়া তাকাইতে পারে না।

যাদব আবার বলিলেন, বাপের বাড়ি যেতে তোমাব খুব ইচ্ছা করে ছোটোবউ ?

খুব ! একটুও করে না।

বাপ নাই, বাপের বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা তার হইবে কেন ? না গিয়া উপায় নাই তাই যাওয়া। সবমা আর তাহাকে এখানে রাখিবেন না। এ সময়ে এ বয়সে নাকি স্বামীব কাছে থাকিতে নাই।

তবে তোমায় একটা জিনিস দেখাই বাছা।—বলিয়া পকেট হইতে যাদব ছোটো একটি ফটো বাহিব কবিয়া সুলতার হাতে দিলেন।

এখানে ওখানে পোকায় কাটিয়া দিয়াছে, লম্বালম্বি পাশাপাশি অজস্র আঁচড় পড়িয়াছে, কিন্তু এ যে একটি তরুণী বধূর ফটো তাহা সহজেই বুঝিতে পাবা যায়।

সুলতা ভালো করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল। সাড়ে তিন হাত মানুষকে তিন ইঞ্চি করিয়া ফেলা হইয়াছে, ম্লান আলোছায়াব সামঞ্জস্যেই রক্তমাংসের পরিচয়, তবু সুলতাব দৃষ্টি ভাবী হইয়া উঠিল, এলোমেলো নিশ্বাস পড়িল।

আমার প্রথম স্ত্রীব ছবি ছোটোবউ। মববাব কয়েক মাস আগে নিজেই তুলেছিলাম ভালো ওঠেনি।

আপনার দু বিয়ে !

যাদব হাসিলেন।

মনোর মা জানেন ?

জানেন বইকী ! খুব ভালো করেই জানেন।

সুলতা বুকের মধ্যে কেমন ভার বোধ করিতেছিল ! চাপা গলায় সে বলিল, খুব ভালো করে জানেন কেন ?

হ্যাঁ। শান্তি বেঁচে থাকলে আজ মনোর মার চেয়ে বুড়ো হয়ে যেত, কিন্তু মরে গিয়ে সে আমার মনে নতুন বউ হয়েই বেঁচে আছে। একি মনোর মা টেব পায় না বাছা ! এই সেদিন আমায় কবিত্ব করে বলছিল, মরে যাওয়ার পব মানুষের বয়স আর বাড়ে না এ বড়ো আশ্চর্য গো, এ বড়ো অন্যায়।

সুলতা সন্দিগ্ধভাবে বলিল, কবিত্ব করে নয়।

না। তাহলে নিজের কথায় নিজেই ও আঁতকে উঠত। তেইশ বছরের অভিজ্ঞতা।

যাদব খানিকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। সুলতার মনে হইল, কাঁচাপাকা গোঁফদাড়ির আড়ালে ঠোঁট দুটি কাঁপিতেছে।

একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা তাহার মাথার মধ্যে দপদপ করিতে লাগিল। পাশে গিয়া বসা যায় না ? দাঁড়ি ফাঁক করিয়া দেখা যায় না ঠোঁট দুটি কাঁপিতেছে কি না ? প্রাচীন যন্ত্রে আত্মার বাণী এমন ক্ষীণ মুমূর্ষু কেন ভাবিয়া সুলতার কান্না আসিবার উপক্রম হইল।

যাদব বলিলেন, মনোর মার সংসারের বাইরে আমার স্থান ছোটোবউ। শান্তির সঙ্গে সুখদুঃখের সম্পর্ক যেখানে শেষ হয়েছিল সেইখানে। মনোর মা আমার নাগাল পায় না। আমি তেইশ বছর পিছিয়ে পড়েছি। ওর কি সহজ দুঃখ জীবনে !

সুলতা তাহা জানে। মাসের পর মাস কাটিয়া যায়, দিনে যে কতবার এ বাড়িতে আসে ঠিক নাই, কিন্তু মনোর মার দেখা মেলে কদাচিৎ। নিজের সংসারের কোনখানে যে তিনি নিজেকে গোপন করিয়া রাখেন খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়।

একশো আট রুদ্রাক্ষের মালা নিয়া তিনি কেবল জপই করেন সারাদিন—একান্তে।

একশো সাতটি রুদ্রাক্ষের পর প্রথমটি আবার ফিরিয়া আসে, গ্রহে গ্রহে পা দিয়া সমস্ত বিশ্ব ঘুরিয়া আসিয়া তিনি বোধ হয় বিশ্বদেবতাকেই প্রণাম করেন। সহজ বিশ্বদেবতা নন, সেই আদিম প্রেমিক, পৃথিবী যখন মাটির ঢেলা, মানুষ যখন খেলার পুতুল, তখন যে সহস্রশীর্ষ বিরাট পুরুষকেই একমাত্র ভালোবাসিতে পারা যায়।

সুলতার মুখের বিবর্ণতা নিরীক্ষণ করিয়া যাদব বলিলেন, বিদায় নিতে এসেছিলে সে কথা তোমার বোধ হয় স্মরণ নেই ছোটোবউ। নির্বোধের মতো মুখ করিয়া সুলতা বলিল, না ভুলে গিয়াছিলাম। কিন্তু বেলা আর নেই। শাশুড়ি হয়তো ওদিকে রাগ করবেন।

সুলতা নীরবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিল। দরজার কাছে পৌঁছিলে পিছন হইতে যাদব বলিলেন, সাবধানে থেকো ছোটোবউ, শরীরের যত্ন নিয়ো।

বলিয়া ঘনঘন দাড়ির মধ্যে আঙুল চালাইতে আরম্ভ করিলেন।

বারান্দায় পা দিয়া সুলতা দেখিতে পাইল রুদ্রাক্ষের মালা হাতে মনোর মা চিত্রার্পিতের ন্যায় একপাশে দাঁড়াইয়া আছেন। ঈষৎ স্থূল দেহে গরদের সজ্জা, চওড়া করিয়া সিঁদুর পরিতে পরিতে সিঁথি রক্তাক্ত টাকের মতো প্রশস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সুলতা তাহাকে প্রণাম করিল।

আঙুলের ডগায় তাহার চিবুকের স্পর্শ আনিয়া চুম্বন করিয়া মনোর মা বলিলেন, ব্যাটা কোলে ভালোয় ভালোয় ফিরে এসো মা।

সকলে ভিড় করিয়া বিদায় দেয়।

পঙ্কু মড়ার মতো হাসে, সুচিত্রা সকলের পিছনে আড়াল খুঁজিয়া নেয়। সরমার মুখের দিকে চাহিয়া সতীশের চোখে পলক পড়ে না। সুমিত্রা উদাসভাবে পথের গ্যাসের আলোটার দিকে চাহিয়া থাকে। হেমন্ত সকলের অগোচরে কী একটা ইশারা করে, লজ্জার ভান করিয়া সুলতা মুখ ফিরাইয়া নেয়। ওঠানামার সময় সাবধানতা অবলম্বনের জন্য যাদব সুলতার দাদাকে নানাবিধ উপদেশ দেন। গাড়িতে বসিয়া সুলতা অনুপস্থিত মনোরমা ও তাহার মার কথা ভাবে।

গুপ্তধন

বর্ষাকালে তো বটেই, বছরের অন্যসময়েও কুল্লী নদীর মেজাজ কুল্লী বরফের প্রধান গুণবাচক শব্দটার ঠিক বিপরীত বিশেষণের অধিকারী। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে একটা শাখা নদী মজিয়া যাওয়ার পর একা একা সমস্ত জলস্রোতকে বহিতে হওয়ায় নদীটা এ রকম গোঁয়ার হইয়া উঠিয়াছিল। হরিখালি এবং তার আশেপাশের কয়েকটা গ্রামও বড়ো নিচু, তাই, মাইল পাঁচেক লম্বা, শহরেব সদর রাস্তাব মতো চওড়া এবং একতলা বাড়ির সমান উঁচু একটা বাঁধ দিয়া এখানে কুল্লী নদীকে ঠেকাইয়া বাখা হইয়াছে। বর্ষাকালে বাঁধের উপর দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিলে বিস্ময় জাগে। এদিকে ভবানদীব ছোটোবড়ো ঢেউ বাঁধের গায়ে আছড়াইয়া পড়িতেছে, ওদিকে এলোমেলোভাবে ছড়ানো পড়িয়া আছে গ্রামের গাছপালা বাড়িঘর, মাঝখানে দুদিকে দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত প্রসারিত প্রকাণ্ড একটা মেটে সাপের মতো আঁকাবাঁকা নদীর বাঁধ। পূর্ণিমা অমাবস্যায় নদীতে সমুদ্রের জোয়ার আসিবার দৃশ্যটি সবচেয়ে অপরূপ। হাত তিনেক উঁচু ফেনিল জলস্রোতকে ছুটিয়া আসিতে দেখিলে চোখে পলক ফেলা যায় না, প্রকৃতির প্রতি মনে সভয় শ্রদ্ধার আবির্ভাব ঘটে।

ভীমের চোখে কিন্তু দৃশ্যটি দেখিযা পলক পড়িত বেশিবেশি, দুচোখ তার মিটমিট করিত এবং মনে মনে সভয় শ্রদ্ধার বদলে দেখা দিত একটা হালকা ছেলেমানুষি আনন্দ।

এইরকম খাপছাড়া লোক ছিল হরিখালিবাসী ভীম।

বেঁটে শীর্ণকায় অকালবৃদ্ধ গোবেচারি ভীমের সঙ্গে গ্রামের কারও যেন বনিবনা হইত না, সকলেই অল্পবিস্তর ভয় করিয়া চলিত তাকে। মানুষকে ঠকাইতে সে ছিল ওস্তাদ। মানুষকে ঠকানো অবশ্য তার ব্যাবসা ছিল না, জীবিকা সে অর্জন করিত ন্যায়সঙ্গত ভদ্র উপায়ে কিন্তু নিজের সম্বন্ধে মানুষের মনে অসংখ্য ভুল ধারণার জন্ম দেওয়া, তার কাছে কেউ কিছু লাভের আশা করিলে তাকে হতাশ করা, কেউ ঠকাইতে আসিলে তাকে একেবারে ঘোল খাওয়াইয়া ছাড়া প্রভৃতি কতকগুলি ভাবী বিশ্রী স্বভাব ভীমের ছিল। তার চেহারা দেখিয়া কে কল্পনা করিতে পারিত, লাঠিখেলার কৌশলগুলি সে এত ভালো আয়ত্ত করিয়াছে যে মাথায় আসল লাঠিয়ালের মতো বাবরি চুল রাখিবার অধিকাব তার ছিল। গোরু-ছাগলের দুধ বেচিয়া ভীম কোথায় এত টাকা পাইত যাতে গোয়ালাপাড়ার অনেকখানি তফাতে কিছু ফাঁকা জমির মধ্যে এগারোটি পলাশগাছের আড়ালে সুন্দর একটি গৃহে প্রায় ভদ্রলোকের মতোই স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে পরম সুখে বাস করিতে পারিত, তাও গ্রামের লোক ভাবিয়া পাইত না। ছোটোলোকের মতো সে অজস্র সুখ উপভোগ করিলে কারও কিছু ভাবিবার ছিল না, কিন্তু ভদ্রলোকের মতো সুখ পাইতে তো পয়সা লাগে। সেটা আকাশ হইতে আসে না। তারপর ভীমের ব্যবহার। ছোট্ট মেনি বাঁদরের মতো তার মুখ খিঁচানোর স্বভাবের জন্য সকলের গা জ্বালা কবিত। সকলের সঙ্গে ভীম যে সব সময় হালকা হাসিতামাশা আর ছেলেমানুষি কৌতুক করিয়া চোখ মিটমিট করিতে করিতে ফিকফিক করিয়া হাসিত সেটাকে সকলে মনে করিত নিছক বাঁদরামি। ঘরে ঘরে এত অভাব অভিযোগ, লোকের মনে এত দুঃখকষ্ট আর সে কিনা এ রকম ইয়ার্কি ফাজলামি করিয়া দিন কাটাইবে ! নিজের ঘরে সে যা খুশি করুক, লোকের সঙ্গে তামাশা করা কেন ? তাও অমন সব কৌশলময় মজাদার তামাশা !

মেজোকর্তার মাথা ফাটানোর তামাশার মধ্যে কিন্তু কিছু কৌশল থাকিলেও মজা বেশি ছিল না। ভীম যে কেন মেজোকর্তার মাথা ফাটাইয়াছিল সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলে মেজোকর্তার

হুকুমে ভীমের ছটা গোরুকে সাতবার খোঁয়াড়ে দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া, কেউ বলে ভীমের বড়ো মেয়ে, তিনপুকুরের কেষ্টর সঙ্গে যার বিবাহ হওয়ায় গাঁ-সুদ্ধ লোক চটিয়া গিয়াছে, মেজোকর্তা তার মানহানি করিয়াছিলেন বলিয়া। শেষেরটাই সম্ভবত সত্য, কারণ ভীমের বড়ো মেয়ে আসিতে না বলিলে রাতদুপুরে মেজোকর্তা তার বাড়ির পিছনে পলাশগাছের কুঞ্জবনে অভিসারে আসিয়া তাকে যে মাথা ফাটানোর সঙ্গত কারণ ও সুযোগ সরবরাহ করিতেন তা সম্ভব মনে হয় না। তা ছাড়া, নিজের মাথাটা কেউ ফাটাইয়া দিলে সে বিষয়ে প্রকাশ্যভাবে চুপচাপ থাকার মতো মানুষও মেজোকর্তা নন।

তবে মেজোকর্তার যে মাথাটা ভীম ফাটাইয়া দিয়াছিল সেটাতে যথেষ্ট বুদ্ধি না থাকিলেও তার টাকা ছিল অনেক এবং মানুষের আনুগত্য গ্রামের জমিদারেরই থাকে বেশি। তাই একদিন রাত্রে বাবুদের বাড়ি মস্ত একটা ডাকাতি হইয়া যাওয়ার পর ভীমকে আট বছরের জন্য জেলে যাইতে হইয়াছিল। ডাকাতির কথাটা মিথ্যা নয়। একজন খুন, তিনজন ভয়ানক জখম আর নগদে গয়নায় প্রায় তেইশ হাজার টাকা লুট,—এ ব্যাপারগুলি সত্যসত্যই ঘটিয়াছিল। ভীম যে নিজে ডাকাতি করিতে যায় নাই এটা গ্রামের অনেকে বিশ্বাস করিত, এখনও করে। তবে ডাকাতির সঙ্গে তার অন্যভাবে যোগ ছিল কি না এ বিষয়ে কেউ নিঃসন্দেহ নয়। ভীমের পক্ষে কিছু অসম্ভব হওয়া যে অসম্ভব—লোকে এখনও এ বিশ্বাস পোষণ করে। মেজোকর্তার বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও ভীমের শাস্তি কিন্তু অন্য ডাকাতের কয়েকজনের তুলনায় হইয়াছিল খুব কম। তারা কুড়ি বছরের জন্য দ্বীপান্তরে গেল, ভীম এবং আরও তিনজন ডাকাত মোটে আট বছরের জন্য বাস করিতে গেল দেশেরই নানা জেলে। আট বছরের মধ্যে আবাব পুরা একটা বছর মাপ করিয়া সাত বছর পরেই তারা ভীমকে দিল ছাড়িয়া !

ভাদ্রমাসের এক দুপুরবেলা ভীম ফিরিয়া আসিল গ্রামে। ভীমকে দেখিয়া গ্রামের লোক যেমন আশ্চর্য হইয়া গেল, নিজের বাড়ি ও বাড়ির পিছনের এগারোটি পলাশ গাছ একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে দেখিয়া ভীম তার চেয়ে কম আশ্চর্য হইল না। স্থানটিতে সৃষ্টি হইয়াছে একটি সমতল মাঠের, বাঁশের তৈরি দু জোড়া গোলপোস্ট দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় এখানে এখন ফুটবল খেলা হয় !

•

চারিদিকে খাঁ খাঁ করিতেছিল ভাদ্রমাসের রোদ। তৃষ্ণা মেটানোর জন্য কাছের একটা পুকুরে যাওয়ায় হাঁদার সঙ্গে ভীমের দেখা হইয়া গেল। হাঁদা তার ভাইপো, কুড়ি-বাইশ বছর বয়স, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল : অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া একটি মেয়ের বাপ হওয়ার পর হইতে বয়স্ক লোকের মতো গম্ভীর ভারিক্কি চালে চলিতে এবং মাছ ধরিতে ভালোবাসে। পুকুরের ঘাট জুড়িয়া মস্ত একটা আমগাছের ছায়া পড়িয়াছিল, পুকুরে ছিপ ফেলিয়া হাঁদা সেই ছায়ায় বসিয়া টানিতেছিল বিড়ি। সাত বছর দেখাসাক্ষাৎ না থাকিলেও পরস্পরকে তারা তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিল। জেলে সাত বছর ভীমের চুল আধ ইঞ্চির বেশি বাড়িতে পায় নাই। হাঁদার তুলনায় নিজের প্রায় ন্যাড়া মাথাটায় সলজ্জভাবে হাত বুলাইয়া ভীম বলিল, কীরে হাঁদা !

হাঁদা ভারিক্কি চাল চালিতে ভুলিয়া গিয়া উত্তেজিতভাবে বলিল, কাকা ! কবে ছাড়ান পেলে কাকা ?

ভীম বলিল, পরশু তরশু হবে কে জানে ! তুই তো মস্ত হয়ে গেছিস হাঁদা, গোঁপ গজিয়েছে তোর !

অজানাকে জানিবার ভয়ে আপনজনেদের সম্বন্ধে হাঁদাকে হঠাৎ সে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিল না, হাঁদার গোঁফ গজানোর জন্য প্রথমটা কিছুক্ষণ অবাক হইয়া থাকিবার সুযোগ পাইয়া সে একটু শান্তি বোধ করিল। হাঁদার সমবয়সি একটি ছেলে সে রাখিয়া গিয়াছিল, কে জানে সেও এ রকম ঝাঁকড়া চুল রাখিয়াছে কিনা, তারও এ রকম গজাইয়াছে কিনা গোঁফ।

তবে এতকাল পরে গ্রামে ফিরিয়া আত্মীয়পরিজনের সংবাদ জানিবার কৌতূহল শুধু কাল্পনিক ভয়ে বেশিক্ষণ ঠেকাইয়া রাখা চলিবে না। প্রথমে ছেলেটার কথাই ভীম জিজ্ঞাসা করিল। না হাঁদার মতো সে গোঁফ গজানোর সুযোগ পায় নাই, ভীম জেলে যাওয়ার কয়েক মাস পরেই স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে। মনটা ভীমের যেন মোচড় খাইয়া গেল। কিছু দুঃসংবাদ শুনিতে হইবে এ আশঙ্কা ভীমের ছিল। তবে প্রথমেই এ ধরনের সংবাদ সে প্রত্যাশা করে নাই। হৃদয়টা পুত্রশোকে গোঁয়ার হইয়া যাওয়ায় বাকি দুঃসংবাদগুলি শুনিবার আতঙ্ক কিন্তু আর তার রহিল না।

একে একে হাঁদা সব সংবাদই দিল। ভীমের বউ আর ছোটো ছেলেমেয়ে দুটি বাঁচিয়াই আছে, তবে ওদের মধ্যে প্রথম দুজন যে বর্তমানে কোথায় আছে হাঁদা ঠিক করিয়া বলিতে পারিল না। অবশ্য দুজায়গায় যে ওরা আছে তাতে হাঁদার কোনো সন্দেহ নাই। হয় তিনপুকুরে বড়ো জামাই কেষ্টর কাছে, নয় কালীতলায় ছোটো জামাই নবীনের কাছে। হ্যাঁ, কালীতলার বুড়া নবীনের সঙ্গেই ভীমের ছোটো মেয়ে রাণীর বিবাহ হইয়াছে।

ভীম জিজ্ঞাসা করিল, এ বিয়ে দিল কে ?

হাঁদা হাঁদার মতো বলিল, বাবা। বাবুরা চালা কেটে তুলে দেওয়ায় খুড়িমা তখন আমাদের বাড়িতে ছিল কিনা—

নবীন তোর বাপকে কত টাকা পণ দিয়েছিল রে ?

তা জানি না কাকা।

তোরা থাকতে তোর খুড়ি জামাইবাড়ি গিয়ে আছে কেন তা তো জানিস বাবা ?

ভীমের গলার আওয়াজে ঝাঁজের খোঁজ পাওয়া যায় না, তবু যে তার কথাগুলি ঝাঁজালো মনে হয়, সেটা সম্ভবত চারিদিকের রোদের ঝাঁজের জন্য। হাঁদার বয়স হইয়াছে, অন্যায়টা সে এখন বুঝিতে পারে। তবে বাপদাদার অন্যায় বলিয়া পুরাপুরি পারে না। গম্ভীর মুখে কৈফিয়ত দেওয়ার মতো করিয়া হাঁদা বলিল, গাঁ সুদ্ধু লোক শত্তুরতা জুড়ল কি না, তাই দুঃখ কষ্ট সইতে না পেরে—

ভীম বলিল, দুঃখকষ্ট হবার তো কথা ছিল না বাবা ! গাঁ-সুদ্ধু লোক শত্তুর হল, আপনজনও তো ছিল গাঁয়ে।

একবার জবাব দিতে না পারিয়া হাঁদা মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়া ঝাঁকড়া চুলগুলি পিছনে হটাইয়া দিল।

তারপর ভীমকে হাঁদা তাদের বাড়ি নিয়া গেল। ক্ষুধায় ভীমের শরীর অস্থির করিতেছিল। শোক দুঃখ যদি বা সে কোনো রকমে সহিতে পারে ক্ষুধার জ্বালা একেবারেই পারে না। বুড়া নবীনের কাছে যে তার মেয়েকে বিসর্জন দিয়াছে, বিপদের দিনে যে তার স্ত্রীপুত্রের দিকে ফিরিয়াও তাকায় নাই, ভয়ানক ক্ষুধা পাইয়াছে বলিয়াই পেট ভরানোর উদ্দেশ্যে তার বাড়িতে যাওয়া ভীম ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব হইত কিনা ভগবান জানেন। হাঁদা দই-চিড়ার ফলারের ব্যবস্থা করিয়া দিলে সে পরম তৃপ্তির সঙ্গেই তাহা ভক্ষণ করিল। মান অভিমান ঘৃণা ক্রোধ প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলি যেন মনের অন্য মনোভাবের রাহাজানির অপরাধে মনের অমানুষিকতার জেলখানায় বাস করিতে গিয়াছে। এ বাড়িতে বিশ্রাম করিতেও সে প্রস্তুত ছিল কিন্তু ইতিপূর্বে বাড়ির কর্তা ফিরিয়া জেলফেরত একটা ডাকাতকে বাড়িতে ডাকিয়া আনার জন্য হাঁদাকে এমন গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল যে, চাঁচের বেড়ার আড়ালে দাঁড়াইয়া কথাগুলি খানিকক্ষণ শুনিবার পর ভীম আস্তে আস্তে এক পা এক পা করিয়া নামিয়া গেল পথে।

পথে চলিতে চলিতে নানা লোকের সঙ্গে দেখা হইতে লাগিল। কেহ কথা বলিল, কেহ বলিল না ; যে বলিল তার কথাগুলিও যে মিষ্টি শোনাইল তা বলা চলে না। এমনিই ভীমকে একদিন যারা পছন্দ করিত না, আজ জেলের ছাপ-মারা সেই ভীমকে তারা খাতির করিবে এ রকম প্রত্যাশা করাই

অন্যায়। ভীমের মুখ দেখিয়া মনে হইল না অন্যায়টা সে করিয়াছে। এতসব বড়ো বড়ো আশা আকাঙ্ক্ষা তার সাত বছরে লোপ পাইয়া গিয়াছে যে হরিখালিবাসী কোনো গৃহস্থের খাতির ও সমাদর পাওয়ার মতো তুচ্ছ প্রত্যাশাকে মনে পোষণ করিবার ধৈর্যও হয়তো তার ছিল না। হাঁটিতে হাঁটিতে ভীম গ্রামের প্রান্তভাগে গোস্বামীদের আমবাগানের একপাশে বাগদিপাড়ায় আসিয়া হাজির হইল। এখন অপরাহ্ণ হইয়া আসিয়াছে, রোদের আর সে রকম তেজ নাই। বাগদিপাড়ার সমস্ত স্ত্রীপুরুষেরাই বোধ হয় একটা খোলা চালার তলে জমা হইয়া হইচই করিতেছিল ; ঠিক চালার তলে নয়, যত লোক একত্র হইয়াছে তার সিকি অংশেরও বোধ হয় চালার নীচে গোবর-লেপা নিচু ভিটাটুকুতে স্থান সঙ্কুলান হইবে না। কোনো একটা উৎসবের জের চলিতেছে তফাতে দাঁড়াইয়াই তাহা বুঝিতে পারা যায়। বিবাহাদি কিছু ঘটিয়া থাকিবে। তাড়ি গেলা যে কবে, অথবা আজ হইতে কখন আরম্ভ হইয়াছিল অনুমান করা অসম্ভব, তবে ইতিমধ্যেই ফলাফলটা ভালোভাবেই ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখানে ওখানে নোংরা অকথ্যভাষায় শুরু হইয়াছে ঝগড়া, দু-একজন চিত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে, দু-একটি স্ত্রীলোকের দিকে তাকানো চলে না। খানিক দূরে দাঁড়াইয়া ভীম অনেকক্ষণ খাপছাড়া দৃশ্যটার দিকে চাহিয়া রহিল।

এই অস্পৃশ্য ছোটোজাতের পাড়ায় সে উদ্দেশ্যহীনভাবে আসিয়া পড়ে নাই, এখানে একদিন তার একটি আকর্ষণ ছিল, নিয়মিত যাতায়াতও ছিল। আকর্ষণটির কুটিরে আসিয়া বসিবার অধিকার পাওয়ার জন্য একদিন অবিকল এইরকম একটি উৎসবের খরচাও দিতে হইয়াছিল তাকে। জীবনে প্রথম সেদিন সে চাখিয়া দেখিয়াছিল তাড়ি ! কত খাপছাড়া শখই যে তখন ছিল ভীমের। এগারোটি পলাশগাছের আশ্রয়স্থিত তার ভদ্র ও নীতিসঙ্গত জীবনযাপনের গৃহটির মতো এখানকার অবৈধ জীবনযাপনের সেই কুটিরটিও নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে দেখিয়া ভীমের চোখ দুটি সজল হইয়া উঠিল। এ আঘাতটা যেন তার হৃদয়ের ব্যথা বোধ করা অংশটুকুর সবচেয়ে দুর্বল দিকটাতে ঘা দিয়াছে—যেখানে ঘা লাগিলে অনায়াসে একটুখানি কান্না আসে। কুকী নাম ছিল সেই লম্বা ছিপছিপে কালো ও নোংরা বাগদি মেয়েটার এবং তার জন্য ভীমের এত বেশি স্নেহ ছিল যে জেলে তার সাত বছরের নারী-সংক্রান্ত কল্পনাগুলির জন্য কদাচিৎ দ্বিতীয় একটি কেন্দ্রের প্রয়োজন হইয়াছে।

ভিড়ের ভিতর হইতে একজন টলিতে টলিতে উঠিয়া আসিতেছিল। কাছে আসিলে ভীম তাকে চিনিতে পারিল। হরিখালির প্রসিদ্ধ চোর মধু। সাত বছরে মধু নিজের ছ্যাঁচড়া চোরের উপযুক্ত রোগা চেহারাটা বদলাইয়া সেকেলে ডাকাতের মতো ভীষণ জোয়ান হইয়া না উঠিলে কাছে আসিবার আগেই ভীম তাকে চিনিতে পারিত।

চিনিতে পারিয়া মধু সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া বলিল, পেরনাম বাবুমশায়। লটা পয়সা দিবান্ ?

বাগদিপাড়ার লোকেরা সাধারণত বাবুমশায় বলে না, বলে কর্তা। কুকী কী জন্য তাকে বাবুমশায় বলিত বলা যায় না। সম্বোধনটা তারপর পাড়ার সকলের মধ্যে ছড়াইয়া গিয়াছিল। ভীম বলিল, দেবরে মধু, নিশ্চয় দেব। এখন তো সঙ্গে পয়সা নেই, রাত্তির বেলা ফের যখন আসব তখন দেব। কুকী কোথায় আছে জানিস মধু ?

মধু উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চালার তলে ভিড়ের দিকে একটা হাত প্রসারিত করিয়া দিয়া বলিল, উই হোথায়।—তারপর সেই হাতটাই নিজের বুকে ঠুকিয়া দিয়া গদগদ কণ্ঠে যোগ দিল, কুকী এখন মোর বাবুমশায়, বেন্দাকে পুলিশে লিয়ে গেছে।

বলিতে বলিতে মধুর মুখ অন্ধকার হইয়া আসিল, সন্দিগ্ধ চোখে চাহিয়া সে বলিল, কুকীর খপর লিচ্ছ যে ? ওসব মতলব কোরোনি বাবুমশায়, আমি লিয়েছি কুকীকে বেন্দাকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়ে, কুকীর দিকে যদি নজর দিবে ত—

ভীম শান্তভাবে, বলিল, তুই খেপেছিস নাকি মধু ? কাল নয়তো পরশু আমি গাঁ ছেড়ে চলে যাব, আর আসব না। কুকীর জন্য আমার কীসের মাথাব্যথা রে, আঁ ? একটা কাজে এসেছি গাঁয়ে, কাজটা হলেই বাস্ আর একদণ্ড গাঁয়ে রইব না। আর শোন বলি মধু, কাজটা যদি হয় তোদের সবাইকার লাভ হবে, অনেক টাকা পাবি তোরা।

কী কাজ বাবুমশায় ?

রাত্তিরে এসে বলব মধু, এখন নয়, সবাইকে বেশি তাড়ি গিলতে বারণ করিস, তুই নিজেও গিলিস না আর, এক-একজন দশ-কুড়ি বারো-কুড়ি টাকা পাবি, কিন্তু আমার কথা না শুনলে সব ফসকে যাবে তা বলে রাখছি বাপু। কাল যত পারিস, আজ রাতে নয়।

দশ-কুড়ি বারো-কুড়ি টাকা দিবে ! কী কাজ বলে যাও বাবু—এই বাবুমশায় শুনে যাও, পায় ধরি তোমার—

গ্রামের আধা-ভদ্র আধা-অভদ্র গৃহস্থ ভীমের জন্য বাগদিপাড়ার সকলে যেমন ভয় ও শ্রদ্ধা পোষণ করিত, অতিরিক্ত মেলামেশার জন্য নিজেদের মধ্যে তেমনই সহজভাবেই তাকে গ্রহণ করিত ! প্রয়োজনের সময় তাকে মানিয়া চলিত সকলেই, আবার আড্ডা দেওয়ার সময় প্রায় সাঙাতের মতোই সকলের মধ্যে সে মিশিয়া যাইত। গ্রামের কারও জন্য ভীমের এতটুকু মাথাব্যথা ছিল না, কিন্তু বিপদে-আপদে এই অস্পৃশ্য ছোটোলোকগুলির সে অনেক উপকার করিয়াছে—বোধ হয় কুকীর জন্য যে কোনো ব্যাপারেই হোক, তার কূটবুদ্ধির সাহায্য পাইলে বাগদিপাড়ায় সকলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে চিরদিন।

সাত বছরে স্মৃতি হয়তো মধুর ঝাপসা হইয়া আসিয়াছিল, তবু একেবারে ভুলিয়া যাওয়ার মতো মানুষ ভীম নয়। ভীমের মুখে টাকার কথা শুনিয়া মধুর চমক লাগিয়া গেল, ব্যাপারটা ভালো করিয়া বুঝিবার জন্য সে মুখে মুখেই কতবার যে পায়ে ধরিল ভীমের তার সীমা নাই।

ভীম কিন্তু শুধু বলিল, রাতে ঘুরে এসে বলব মধু, সবাই থাকিস এখানে। তাড়ি খাস না আর।

তাড়ির নেশায় আধা বিভ্রান্ত মধু হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, ভীম সরু পথটি ধরিয়া জোরে হাঁটিতে আরম্ভ করিল। এক এক ধরনের পাগলামি থাকে মানুষের সোজা কথায় লোকে যাকে বলে ছিট আর শুদ্ধ ভাষায় বলে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য—যা স্থায়ী কিন্তু অস্থায়ী নেশার চেয়ে জোরালো। পথ চলিতে চলিতে আপন মনে ভীমের মেনি বাঁদরের মতো মুখ খিঁচানো দেখিলে, একদিন তার বাঁদরামিতে গাঁয়ের যত লোক বিরক্ত হইত তারা সকলে আজ অবাক হইয়া যাইত। ভীমের খাপছাড়া মনটাতে বড়ো যন্ত্রণা হইতেছিল। মানুষটা আসলে সে ছিল খুব সরল, কেবল জীবনটাকে সে জিলাপির চেয়েও বাঁকা বলিয়া জানিত বলিয়া হরদম ও রকম বাঁকা ব্যবহার করিত, খাপছাড়া স্বভাবের পরিচয় দিয়া গাঁ-সুদ্ধ লোককে বিরক্ত করিয়া তুলিত। জেলে সে জীবনের আরও কয়েকটা অতিরিক্ত প্যাঁচের সন্ধান পাইয়াছে। ফলে আরও গভীরতর ও সম্পূর্ণতর বিকাশ হইয়াছে তার প্রকৃতির। এখন সে একা একা নিজের মনে, দর্শক না থাকিলেও, অতুলনীয় কৃতিত্বের সঙ্গে মুখ ভ্যাংচাইতে পারে।

গ্রামের কয়েকটি মাত্র পাকাবাড়ির মধ্যে বাবুদের বাড়িটিই প্রকাণ্ড—তিন-তিনটা মহাল আছে বাড়িটার। মুখ ভ্যাংচানোর সাধ মিটিয়া গেলে গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে নদীর ধারে বাঁধটার উপর কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে পাক খাইয়া সূর্যাস্তের সময় ভীম বাবুদের বাড়ির সদর মহলের সামনের বাগানটিতে প্রবেশ করিল। বাগানে একটি কাঁঠালি চাঁপার গাছের তলে আরাম কেদারায় কাত হইয়া মেজোকর্তা আরাম করিতেছিলেন। কয়েকটি লুকানো কাঁঠালি চাঁপা সবে ফুটিবার উপক্রম করিয়াছে, তাই স্থানটিতে গাঢ় মোহকরী গন্ধ এমন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে একবার নিশ্বাস টানিয়াই আবেগে ভীমের যেন আবার একটুখানি কান্না আসিবার সম্ভাবনা দেখা দিল। মধু তাকে যেভাবে সাষ্টাঙ্গে

প্রণাম করিয়াছিল মেজোকর্তাকে তেমনিভাবে প্রণাম জানাইয়া এ ভাবটা ভীম সামলাইয়া নিল অতিকষ্টে।

মেজোকর্তা সবিস্ময়ে বলিলেন, কে ? ভীম ? কী চাস তুই ?

ভীম জোড়হাতে বলিল, বাবু, একটা নিবেদন জানাতে এসেছি, একটা ভিক্ষা চাই বাবু আপনার ঠেঁয়ে। যা হবার তা তো হল, এবার গরিবকে মাপ করে দিন। আমি হলাম গিয়ে আপনার ছিচরণের দাস। আপনি বিরাগ হলে কি আমার রেহাই আছে বাবু ? একটা উপকার করে দিন কত্তা যাতে গাঁয়ে একটা ঘরটর বেঁধে—

মেজোকর্তা সিধা হইয়া বসিয়া বলিলেন, তোর তো স্পর্ধা কম নয় ভীম ! তুই আমার কাছে এসেছিস এ সব কথা বলতে !

ভীম কাতর কণ্ঠে বলিল, আমি বাবুর চাকর।

মেজোকর্তা তখন একটা হাঁক দিলেন। দুজন চাকর আসিয়া দাঁড়াইতে মেজোকর্তা বলিলেন, এ হারামজাদাকে ঘাড় ধরে বের করে দে তো। ব্যাটা আমার সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে এসেছে।—কাল যদি তোকে গ্রামে দেখতে পাই ভীম, জুতো মারতে মারতে গ্রাম থেকে দূর করে দেব। পাজি, ডাকাত, হারামজাদা !

ভীম চলিয়া গেলে আরাম কেদারায় কাত হইয়া মাথায় চুলের নীচে লুকোনো একটা ফাটার উঁচু চিহ্নে হাত বুলাইতে বুলাইতে মেজোকর্তা লুকানো কাঁঠালি চাঁপা ফুলগুলির গাঢ় গন্ধ মেশানো বাতাস নিশ্বাসে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। একটা দীর্ঘনিশ্বাস যে তিনি কেন ফেলিলেন, সেটা ঠিক বোঝা যায় না।

আজ তিথি ছিল দশমী। ভীম যখন বাগদিপাড়ায় ফিরিয়া আসিল তখন চাঁদ উঠিয়াছে কিন্তু ছাড়া ছাড়া মেঘের জন্য ভালো করিয়া জ্যোৎস্না ছড়াইয়া পড়িতে পারিতেছে না। কয়েকটা মশাল জ্বালিয়া তখনও সকলে চালার নীচে উৎসব করিতেছিল। শুধু যে কয়েকটি স্ত্রীলোকের দিকে অপরাহ্নবেলায় তাকানো চলিত না, তারা চলিয়া গিয়াছে। ভীম আশা করিতেছিল কুকীকে দেখিতে পাইবে। কিন্তু মধু সম্ভবত তাকেও সরাইয়া দিয়াছে।

মধুকে বিশেষভাবে বলিয়া গেলেও তাড়ি গিলিয়া দু-চারজনের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া ভীম মনে মনে আপশোশ করিতে লাগিল। তবে একটা সান্ত্বনার কথা এই যে পাড়ার বুড়া মোড়ল বিষ্টুও নেশায় চিত হইয়া চোখ বুজিয়াছে। বিষ্টুর সম্বন্ধেই ভীমের একটু ভাবনা ছিল,—লোকটা বড়ো চালাক বিষ্টু, বড়ো খুঁতখুঁতে তার প্রকৃতি। যে কথা আজ সে সকলকে বলিবে, যে কাজ সকলকে দিয়া করাইয়া নিবে, বুড়া তার মধ্যে হয়তো ভয়ভাবনার অনেক কিছুই আবিষ্কার করিয়া সকলকে দমাইয়া দিত। নেশায় যারা কাবু হইয়া পড়িয়াছিল, তাদের বাদ দিয়া জোয়ান লোকগুলিকে গুনিয়া দেখিতে পাইল সর্বসমেত সাতাশজন আছে, দু-চারজন সবলদেহা স্ত্রীলোকও পাওয়া যাইতে পারে। বাগদি মেয়েরা পুরুষের কাজ করিতে অপটু নয়।

একটা চাটাই পাতিয়া ভীমকে বসিতে দেওয়া হইয়াছিল। দশ-কুড়ি, বারো-কুড়ি টাকার ইঙ্গিতটা মধু বোধ হয় ইতিমধ্যেই প্রকাশ করিয়া দিয়াছিল, ঔৎসুক্য, সন্দেহ ও আশায় বিচলিত গরিব ছোটোলোক নারীপুরুষগুলি ভীমের চারিদিকে ঘেরিয়া আসিল।

ভীম বলিল, কেউ গোলমাল করবে না, যা বলব শুনবে নয়তো সব ফসকে যাবে কিন্তু, গাঁয়ের লোক টের পেলে বিপদ হবে। সবাই চুপ, শব্দটি নয়—বাবুদের বাড়ি ডাকাতি করার জন্য সাত বছর জেলে ছিলাম জানিস তো সবাই ? বেশ, এখন কথা হল, গাঁয়ে আবার আমি ফিরে এলাম কী জন্য ? আমার ঘরবাড়ি গেছে, জমিজমা গোরু বাছুর গেছে, ছেলে বউ কেউ গাঁয়ে নেই, গাঁ-সুদ্ধ লোক পিছনে লেগেছে, গাঁয়ে আমি ফুরতি করতে আসিনি বাবু হাঁ !

মধু বলিতে গেল, বাবুমশায়—

ভীম বলিল, তুই থাম মধু। যত গয়না টাকা লুট করেছিলাম আমরা, সব গাঁয়ের এক জাগায় পুঁতে রেখেছিলাম। সবাই তো ধরা পড়ে জেলে গেলাম, কে আর গয়না টাকাগুলো নিতে আসবে ? সব এখনও সেথায় পোঁতা আছে। সবায়েব আগে আমি ছাড়া পেলাম। আজ রাত্তিরে সব খুঁড়ে নিয়ে সরে পড়ব। কিন্তু কী মুশকিল হয়েছে জানিস মধু, সবাই মিলে মস্ত গর্ত খুঁড়ে পুঁতে রেখেছিলাম। আমি দুব্বোল মানুষ, একলা খুঁড়ে বার করতে পারব না। আর কী জানিস ঠিক যেখানে সব পোঁতা হয়েছিল, একটা চিহ্ন ছিল সেখানে, সে চিহ্ন হারিয়ে গিয়েছে।

মধু ব্যাকুলভাবে বলিল, তবে ? তবে কী হবে বাবুমশায় ?

ভীম শান্তভাবে বলিল, কী আবাব হবে ? চিহ্ন না থাক, জায়গাটা তো চিনি। খানিকটা জাযগা বেশি খুঁড়তে হবে, এই মাত্তর। নয়তো তোদের ডাকব কেন বে ? তোদের এতগুনো মানুষকে দশ-কুড়ি করে টাকা দিতে আমার কতগুনো টাকা যাবে বল তো ? সাধ করে কেউ তা দেয় ? কিন্তু কী করব, আজ রাত্তিরে খুঁড়ে তোলা চাই সব, কাল আরও তিনজনে ছাড়া পাবে।

বিপিন নামে একজন বলিল, দশ কুড়ি লয় বাবুমশায়, বাবো কুড়ি বলেছ।

ভীম বলিল, আচ্ছা আচ্ছা তাই দেব—বাবো কুড়িই দেব। আগে খুঁড়েই বাব কর তো বাক্‌সোটা। সব যদি পাইরে আমি, তোদেব বারো কুড়ি করে টাকা দিতে মবব না। কোদাল ফোদাল যা আছে যার ঘবে সব খুঁজে পেতে নিযে আয় সবাই, একটু রাত্তির হলে সেথায় নিয়ে যাব। কারও কাছে কথাটি ফাঁস কোরোনি কিন্তু বাবু কেউ, তা হলে সব্বোনাশ হবে।

মধু কাছে আসিয়া ফিসফিস করিয়া অনুযোগ কবিল, এত লোককে কেন বললে বাবুমশায় ? বেছে বেছে কজনকে বললে হত।

ভীম বলিল, অনেক লোক চাই মধু, দু-চারজনের কম্মো নয়। বাতাবাতি কত খুঁড়তে হবে তুই কী বুঝবি।

পুলিশের কথা তুলিয়া দু-একজন একটু খুঁতখুঁত করিতে লাগিল। ভীম তাদের অভয় দিয়া বলিল, কীসের পুলিশ ? জেল খেটে আসিনি আমি ও গযনা টাকার জন্য ? ও সব এখন আমার সম্পত্তি। কিছু ভয় নেই বাবু তোদেব—বিপদ ঘটে তো আমার ঘটবে, তোদেব কী ?

একে একে কোদাল খন্তা শাবল প্রভৃতি মাটি খুঁড়িবাব যন্ত্র আসিয়া হাজির হইতে লাগিল। একজন, নেশাটা তার একটু জোরালো হইয়াছিল, ঘাড়ে করিয়া একটা লাঙল পর্যন্ত নিয়া আসিল। টাকার পরিমাণের কথা ভাবিয়া সকলে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল, সকলকে শান্ত কবিযা রাখিতেই ভীমের বেগ পাইতে হইল বেশি। ক্রমে ক্রমে সবচেয়ে সন্দেহপ্রবণ ভীবু লোকটিরও ভীমেব উপব বিশ্বাস জন্মিতেছিল। টাকা ও গয়না পুঁতিয়া বাখার কথাটাতে আশ্চর্যেব কী আছে ? ডাকাতি হইয়াছিল সত্য, গয়না ও টাকাগুলি কোনো এক জায়গাতে ডাকাতেরা লুকাইয়া রাখিয়াছিল বইকী—সব ডাকাতেই তাই করে। তারপর ধরা পড়িয়া ডাকাতেরা যে জেলে গিয়াছিল, ভীম যে সাত বছর জেলে কাটাইয়া ছাড়া পাওয়া মাত্র গ্রামে ছুটিয়া আসিয়াছে, তা মিথ্যা নয়। সন্দেহ করার কী আছে তবে ? আজ রাতারাতি সব তারা বড়োলোক হইযা যাইবে।

ক্রমে ক্রমে রাত্রি বাড়িতে লাগিল, চাঁদটা আকাশের অনেকখানি উঁচুতে উঠিয়া কিছুক্ষণেব জন্য চারিদিক জ্যোৎস্নায় ঢাকিয়া দিল, তারপর মেঘ উঠিয়া নামিল বৃষ্টি। ভীম বলিল, চ মধু, এবার আমরা যাই।

বিষ্টির মধ্যে ?

তাই তো ভালো, কেউ দেখতে পাবে না যাবার সময়।

কারও দেখিতে পাওয়ার সম্ভাবনা বৃষ্টি না নামিলেও খুব বেশি ছিল না। গ্রামের প্রান্তে নদীর কাছাকাছি বাগদিপাড়া, সন্ধ্যার পরেই অঞ্চল নির্জন হইয়া আসে। খুঁড়িবার যন্ত্রপাতি কাঁধে করিয়া

সাতাশজন পুরুষ ও পাঁচটি মাঝবয়সি স্ত্রীলোক কিছু পিছনে চলিতে লাগিল, আগে আগে নদীর দিকে হাঁটিতে হাঁটিতে বৃষ্টিতে ভেজা সত্ত্বেও ভীমের মনটা খুশি হইয়া উঠিল। এর নাম সর্দারি। এমনিভাবে দল বাঁধিয়া এক একটা মানুষ সংসারে বড়ো বড়ো কাজ করে। সে কোথায় নিয়া চলিয়াছে সকলকে এই বর্ষা বাদলের মধ্যে ? তার নিজের কাজের জন্য ! তার অনেক দিনের স্বপ্ন সফল করার জন্য ! আত্মপ্রসাদের অন্যমনস্কতায় জোরে জোরে পা ফেলিয়া হাঁটিতে গিয়া পিছল পথে ভীম একবার একটা আছাড় খাইল। তা হোক। জল মাটির সঙ্গে আজ তার পিরিতির সীমা নাই। বত্রিশজন মানুষ মিলিয়া আজ যে মাটি খুঁড়িয়া তুলিবে, মুঠা ভরিয়া সে মাটি তুলিয়া নিজের মুখে মাখিতেও ভীমের আজ আপত্তি থাকিবে না।

নদীর ধারে বাঁধের উপর উঠিয়া ভীম বাঁধ ধরিয়াই সোজা দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিল। কিছুদূর আগাইয়া বাঁয়ে দেখা দিল খেত, তারপর ছোটোখাটো একটা জঙ্গল। আধা জঙ্গল আধা বাগান এটা, আম কাঁটাল পলাশ পিপুল বাবলা প্রভৃতি গাছগুলি বিশৃঙ্খলভাবে গজাইয়া উঠিয়া বাঁধের গা পর্যন্ত ঘেঁষিয়া আসিয়াছে, বড়ো বড়ো গাছের ফাঁকগুলিতে শুধু জঙ্গুলে-চারা ঠাসা। আরও খানিকটা আগাইয়া ভীম থামিয়া গেল। এখন গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে, আকাশেব মেঘ পাতলা হইয়া আসায় একটা অপার্থিব মৃদু সাদাটে আলোয় চারিদিক অস্পষ্টভাবে নজরে পড়িতেছে। সকলের আগে ভীম সাবধানে সঙ্গের নরনারীদের গুনিয়া দেখিল, তারপর উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলিল, একজন কমল কেন রে ? কে পিছনে পড়ে রইল ?

জবাব দিল মধু, বলিল, কুকী এসেনি বাবুমশায়, রাস্তায় পড়ে আছে।

কুকী আসছিল নাকি ? আমি দেখিনি তো !

দেখেছ বাবুমশায়, দেখেছ। খন্তা লিয়ে মোটামতো মেয়েলোকটা আসছিল না, সে তো কুকী।

মধু নাকি অনেক বারণ করিয়াছিল কিন্তু কুকী কথা শোনে নাই, প্রাণপণে তাড়ি গিলিয়াছিল। তারপর আসিতে আসিতে ধপাস। নাড়া দিয়া হুঁশ নাই দেখিয়া রাস্তার ধারে গাছতলার দিকে ঠেলিয়া দিয়া মধু চলিযা আসিয়াছে।

বিষ্টিতে হুঁশ হলে ঘরকে ফিরে যাবে বাবুমশায়।

সে জন্য ভীম ভাবে না, সে শুধু অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল যে কুকীকে সে চিনিতে পারিল না কেন ? খন্তাধারিণী মোটা স্ত্রীলোকটির দিকে তো কতবার তার চোখ পড়িয়াছিল ! চিনিতে পাবিলে কুকীর সঙ্গে দু-চারটা কথা বলিত ভীম। কিন্তু কুকীও কেন তাকে চিনিতে পারে নাই ? তার তো চিনিতে কোনো বাধা ছিল না ! মধুর ভয়ে কি কুকী তার সামনে আগাইয়া আসে নাই, তার সাত বছরের দুর্দশার জন্য বিনাইয়া বিনাইয়া একটু সহানুভূতি জানাইবার চেষ্টা করে নাই, নিজে সে এতকাল কত কষ্ট পাইয়াছে সে কাহিনি বলিবার সাধ দমন করিয়াছে। মেজোকর্তার সম্মুখ হইতে ভীম অনায়াসে বিষণ্ণমুখে উঠিয়া আসিতে পারিয়াছিল, এখন কিন্তু মধুকে তার মুখ ভ্যাংচাইতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। অন্তরটা গভীরভাবে নাড়া খাইলে ভীমের মুখের চামড়াই সকলের আগে বিদ্রোহ করে।

বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভীমের দলটির প্রচণ্ড উৎসাহ ও উত্তেজনা মাঝখানে একটু দমিয়া গিয়াছিল, এইখানেই আশেপাশে কোথাও টাকা ও গয়নাগুলি পোঁতা আছে বুঝিতে পারিয়া এবং তাড়ির নেশায় আজ সকলেরই বুঝিতে পারার প্রক্রিয়াটা একটু কমবেশি বিশেষভাবে সম্পন্ন হইতে থাকায়, সকলে আবার মহোৎসাহে কলরব জুড়িয়া দিল।

ভীম বলিল, চুপ, চুপ ! একদম চুপ সবাই।

সকলেই আজ ভীমের একান্ত বাধ্য ও অনুগত। মুহূর্তে সকলেই স্তব্ধ হইয়া গেল। বাঁধের গা ঘেঁষিয়া, পরস্পরের প্রায় ত্রিশ হাত তফাতে দুটি পিপুলগাছ আকাশে মাথা তুলিয়াছিল। সেই গাছ দুটি দেখাইয়া দিয়া ভীম সকলকে বুঝাইয়া বলিল যে এই দুটি গাছের মাঝখানে বাঁধের কোনো এক

স্থানে তাদের প্রার্থিত গয়না ও টাকা পোঁতা আছে। ঠিক কোনখানে পোঁতা আছে ভীম তা বলিতে পারিবে না, পুঁতিবার সময় তাড়াতাড়ি ছোটো একটা পাথর জায়গাটার উপরে চিহ্নস্বরূপ রাখিয়া দিয়াছিল, পাথরটা যে কোথায় গিয়াছে ! কেউ হয়তো সবাইয়া নিয়া গিয়াছে। না, কেউ মাটি খুঁড়িয়া আগেই সব তুলিয়া নিয়া গিয়াছে কারও এ ভয় করাব কাবণ নাই। কে জানিত যে পাথরটার তলে বিশ বাইশ হাজার টাকার গুপ্তধন পোঁতা আছে ? তা ছাড়া আগে এখানটা খোঁড়া হইয়া থাকিলে তার চিহ্ন থাকিত, টাকা ও গয়না অনেক নীচে পোঁতা আছে, অনেক ভিতরের দিকে। বাজে কথায় সময় নষ্ট না করিয়া সকলে বাঁধের এদিকেব ঢালুর মাঝামাঝি স্থানে খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়া দিক, তারপর কোনদিকে কীভাবে কত দূর পর্যন্ত খুঁড়িয়া চলিতে হইবে, যথাসময়ে ভীম সে নির্দেশ দিবে। প্রাণপণে খাটুক সকলে, সমস্ত আলস্য ভুলিযা যত তাড়াতাড়ি পারে খুঁড়িযা চলুক, কেননা, আজ বাত্রির মধ্যেই যেমন করিয়া হোক লোহার বাক্‌সোটা তো আবিষ্কাব করা চাই।

সৈন্যদের মতো উচ্চস্তরের নিখুঁত ট্রেনিং কয়েদিরা না পাক, দল বাঁধিয়া ওয়ার্ডাবের হুকুমে ওঠাবসা চলাফেরা করার কায়দাটা তারা আয়ত্ত কবে। দুঃখের বিষয়, ভীমের দলে জেলের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কয়েদি কয়েকজন থাকিলেও সমস্ত দলটাকে পরিচালনা করিতে তাকে বেগ পাইতে হইল কম নয়। তবু যতটুকু শৃঙ্খলার সঙ্গে সকলকে সে মাটি খুঁড়িবার কাজে লাগাইয়া দিতে পারিল তাও তার সাত বছর জেলে থাকিবার ফল। নিজেকে একদল কয়েদির ভারপ্রাপ্ত ওয়ার্ডাব কল্পনা করিলে ভীমের আনন্দ হইত সন্দেহ নাই কিন্তু তার অনেক দিনের চিন্তা-পুষ্ট আরও বড়ো, আবও উদভ্রান্ত কল্পনাব কাছে এ সব কল্পনা এখন তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল। আকাশ আরও পবিষ্কার হইয়া আসিযাছে। জ্যোৎস্নার তেজ বাড়িযাছে। বাঁধের উপব দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিতে চাহিতে ভীমেব চোখ দুটি মিটমিট করিতে লাগিল। ভীমেব চোখে আধা-বন আধা-বাগানটির মধ্যে বিশ্বেব বহস্য আসিযা আজ জমাট বাঁধিয়াছে, ভীতিকর সর্বনাশা সম্ভাবনা এবং কারণহীন আতঙ্ক সে সমস্ত মিশিযা গড়িয়া উঠিযাছে প্রত্যেকটি দূরত্বের দেবদেবী ও ভূতপ্রেত, জীবনে শুধু যাদেরই চরম কর্তৃত্ব। এদিকে নদীর জলরাশি ভাটা শুরু হওয়ার সম্ভাবনায় থমথম করিতেছে। এখন তার জল বাড়িবে না। আর কতটুকু উঠিতে পাবিলে ঘোলাটে জল বাঁধটা ডিঙাইতে পারিত ? দেড় হাত ? দুহাত ? এবার জল কমিতে আরম্ভ করিবে। সমুদ্রের জলের দেবতা নদীর জল শুষিতে আরম্ভ কবিবেন। তা হোক, সে দেবতা ডাকাত নন, কৃপণ নন। শেষ রাত্রে জোয়ারের কৌশলে সমস্ত জল তিনি ফেরত পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম ইঙ্গিতে আসিবে মানুষের বুক সমান উঁচু ফেনিল সশব্দ বন্যা। ততক্ষণে ভীম তার অভ্যর্থনাব জন্য প্রস্তুত হইযা থাকিবে। বছরের পর বছর ধরিয়া যে মাটির বাঁধ নদীর এই জলরাশিকে ঠেকাইযা রাখিয়াছে, ঝপাঝপ শব্দে একত্রিশটি কোদাল শাবল ও খন্তা আজ ভীমেব ইঙ্গিতে ক্ষয় কবিযা চলিয়াছে তার অঙ্গ। এখানে বাঁধের ত্রিশ হাতেরও বেশি অংশ হইয়া থাকিবে কয়েক হাত চওড়া মাটির একটা পর্দা, জোয়ারেব প্রথম আবির্ভাবে সে পর্দা ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। তারপর কে ঠেকাইয়া রাখিবে জোয়ারের ক্রমবর্ধনশীল নদীর দুরন্ত জলরাশিকে ? একবার একটি সংকীর্ণতম প্রবেশপথ পাইলে নদীর জল দুপাশের বাঁধ ভাঙিয়া ভাঙিয়া নিজের পথ বড়ো করিয়া নিবে নিজেই। বাঁধের এ পাশের নদী গিযা পৌঁছিবে বাঁধের ও পাশের গ্রামে। মাঠে ঘাটে পথে, বাড়ির উঠানে, ঘবেব বোয়াকে, ঘবের মেজেতে, চৌকির বিছানায়—কে জানে আরও কত উঁচুতে উঠিবে নদীর জল ! বাবুদের বাড়ির দোতলায পৌঁছিতে পারিবে না এই যা আপশোশ। চোখের পলকে বন্যাটা গিয়া যদি সমস্ত গ্রামকে, বিশতলা জলের নীচে তলাইয়া দিতে পারিত, যদি নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া যাইত হরিখালি গ্রাম !

কুকী যদি গাছতলাতেই নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া ঘুমাইয়া থাকে, সে বোধ হয় তবে ডুবিয়া মরিয়া যাইবে। যতখানি জল পৌঁছিবে সেখানে বেহুঁশ ঘুমন্ত মানুষকে ডুবানোর পক্ষে তাই যথেষ্ট।

ভীমের মুখটা যেন হঠাৎ বিকৃত হইয়া নদীকে ভ্যাংচাইয়া উঠিল। এ মুদ্রাদোষটা বড়ো অবাধ্য।

প্যাঁক

মোটর বললে, প্যাঁক।

হাঁসও বললে, প্যাঁক।

মোটর থামিয়ে মাংস খেলাম। কেবল রান্না-করা হাঁসের শক্ত মাংস নয়, শকুন্তলার কাঁচা নবম নিটোল—

মোটরেরই দুটি হর্ন যেন। কিন্তু বোবা। বিধাতা কি হর্ন বাজান নিঃশব্দে ?

গাছতলায় কাঁটা-ঝোপের আড়ালে ঝরাপাতা আর মরাফুলের শয্যা—

আর লেখা গেল না। সুশান্তের নাকে গন্ধ লাগিয়াছে চিংড়ি মাছ ভাজার, মনে ধাক্কা লাগিয়াছে আকস্মিক ক্ষোভের। মোটর কোথায় ? শকুন্তলা ? কোথায় হাঁস ? রান্না করা হাঁসের শক্ত মাংস ? গাছতলা, কাঁটাঝোপ, ঝরাপাতা, মরাফুল ? মুখে একটা বিড়ি গোঁজা, হাতে একটা সস্তা কলম, তক্তপোশে একটা ময়লা চাদর, শীতেব গোড়ায় ঘর জুড়িয়া একটা বর্ষাকালের ভ্যাপসা গুমোট।

শূন্য ঘর, সেই জন্যই যেন আসলে যত ছোটো তার চেয়েও ছোটো মনে হয়।

তবু সব সহ্য হয় সুশান্তের, চোখের উপর যে পর্দা পড়িয়াছে তাতে সব আড়াল হইয়া থাকে, কিন্তু এই কলম-ধরা শীর্ণ হাতের মুঠায় হর্ন কই ?

একতলার ভাড়াটে শিবচরণের মোটা শক্ত হাতের মুঠা হর্ন বাজাইয়া বাজাইয়া ক্লান্ত। বেচারি ট্যাক্সি চালায়, অনেকদিনের পুরানো একটা ট্যাক্সি। গাড়িটা তার বউয়ের চেয়েও পুরানো, বউ তো সবে তার তৃতীয় সন্তানটির মুখে স্তন দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

চিংড়ি মাছ বোধ হয় রাঁধিতেছে শিবচরণের বোন মালতী। সেই দুবেলা রান্না করে, কারণ শিবচরণের অন্ন তার দুবেলাই খাইতে হয়, এখনও স্বামী জোটে নাই। মালতীর জন্য সুশান্তের মনে একটু মমতা আছে, সে দুবেলা রান্না করে বলিয়া অথবা এখনও স্বামী জোটে নাই বলিয়া, সুশান্ত ঠিক জানে না। তবে মালতী কাঠির মতো সরু বলিয়া যে নয় তাতে সন্দেহ নাই। কাঠির মতো রোগা হোক, রোগে মেয়েটা ভোগে না। একতলাটা শিবচরণ ভাড়া নিয়াছে বছর দুই, এই দুবছরের মধ্যে মেয়েটা না পড়িয়াছে একদিনের জন্য জ্বরে, না ধরিয়াছে একদিনের জন্য তার মাথা, পুরানো মোটর হুডে আড়াল করা পিছল কলতলায় একদিনের জন্য আছাড় পর্যন্ত সে খায় নাই। মনস্তত্ত্বের খান কয়েক বই পড়িয়া মনের ভাব বিশ্লেষণ করিবার স্বাভাবিক অন্ধ ক্ষমতাটা বজ্রাহত চারার মতো মরিয়া গিয়াছে, নিজের মনে যে ভাব জাগে নিজেই তার একটা কারণ নিঃসন্দেহে আবিষ্কার করিতে সে আর পারে না, তাই শুধু অনুমান করে যে হয়তো মালতীর মুখের চিরস্থায়ী অতি মৃদু পুলকের ছাপটা তার মমতার কারণ। কিছু নাই মালতীর, তবু যেন কোনো একটা কারণে সে কিছু চায় না, আলস্যের মতো অতি জোলো একটা আনন্দ দিবারাত্রি বিনামূল্যে উপভোগ করে। কীভাবে এক চামচ চিনি সংগ্রহ করিয়াছে বেচারি, তাই দিয়া তৈরি করিয়াছে এক পুকুর শরবত, ক্রমাগত পান করিয়া যায় তবু ফুরায় না।

দামি প্যাডের উপর সস্তা কলমটা রাখিয়া সুশান্ত ঘরের সম্মুখে রোয়াকে আসিয়া দাঁড়ায়। দেড় হাত চওড়া ত্রিকোণ রোয়াকে, তিনদিকে চারখানা ঘর, একটিতে সুশান্তর মা দুবেলা রাঁধেন, স্বামীপুত্রকে ভাত বাড়িয়া দেন আর দুবেলা ভাতের হাঁড়ি চাঁছিয়া মাছের কাঁটা বাছিয়া ডাল তরকারির পাত্র পুঁছিয়া স্বামীর থালাতে জড়ো করেন, পেট নাকি তাঁর এই ভাবেই দুবেলা আকণ্ঠ ভরিয়া ফেলা সম্ভব হয়।

সুশান্তের মার এই অদ্ভুত ক্ষমতার কথা শিবচরণের বউ জানে। তাই মাঝে মাঝে ঠিক এই সময়ে সহানুভূতি জানাইতে মালতীকে পাঠাইয়া দেয়। পাঠায় সে অন্য মতলবে, কিন্তু মালতীর মনে হয় কুকুর-বিড়ালের মতো থালাবাটি চাটিয়া পেট ভরানোর কৌশলটা শিখিতে পাঠাইয়াছে।

নিজেকে একই দুঃখে দুঃখী মনে করায় সহানুভূতিটা সে জানাইতে পারে আন্তরিক আর গভীর। দুচোখে জল পর্যন্ত আসিয়া পড়ে।

ওই খেয়ে কী করে বাঁচবেন মাসিমা ?

সুশান্তের মা বাঁ হাতে কপালে করাঘাত করেন।

কোনো সাধ কি মিটবে, কপাল যে পোড়া !

মালতীর সহানুভূতি আরও গভীর হইয়া আসে। বুকের ভিতর তোলপাড় করে।

কপাল না পোড়া হলে ছেলে আমার বিগড়ে যায়, তোর মতো লক্ষ্মী মেয়েকে বউ করতে পারি না ! দেবে এবার তোর দাদা তোকে কাব হাতে বিলিয়ে, আমাব শেষে জুটবে একটা অলক্ষ্মী পেত্নি। আমার অদেষ্টে সুখ নেই মালতী।

দুবেলা পেট ভরিয়া ভাত জোটার চেয়ে দরদি ছেলেব বউ থাকাটা বেশি সুখের কিনা মালতী জানে না। তার বিগড়ানো ছেলের হাতেই বোনকে দিবাব জন্য শিবচরণ যে ওত পাতিয়া আছে, সুশান্তের মাকে কোনো কৌশলে এ সংবাদটা দিতে না পারিয়া মনটা খুঁতখুঁত করে মালতীব। একটু ভাবিযা এতক্ষণের আন্তরিক দবদের সঙ্গে আরও খানিকটা কৃত্রিম দবদ জানায়, দরদ জানানো ছাড়া আব কিছু তো তার করিবার উপায় নাই।

যা রাঁধেন সব দিয়ে দেন, নিজেব জন্যে কিচ্ছু রাখেন না। আমি হলে—

নেই বাছা নেই, অদেষ্টে আমাব সুখ নেই। ছেলেটা নইলে মানুষ হযনা ? তোকে বউ কবে এনে দুটো দিন একটু সুখের মুখ দেখতে পাই না ?

আর সকলের মতো, জীবনযাত্রার মতো, কথাও দুজনেব এক সুবে বাঁধা। এক সময়ে কেবল একটা আপশোশ থাকে, অন্য আপশোশগুলি খাজনা দিযা রাজাব মতো তাকেই কবে পুষ্ট।

চিংড়ি মাছ রাঁধছিলি তুই ?

হ্যাঁ, এই বড়ো বড়ো চিংড়ি মাসিমা, তেরোটাতে প্রায় দু সের হবে। ভাজতে গিয়ে সব তেল ফুরিয়ে গেল বলে বউ এমন বকছিল।

কত করে সের নিলে ?

কেনা নয় তো, কে যেন দাদার গাড়িতে ফেলে গিয়েছিল। কার জিনিস কে খায।

একটু লজ্জা বোধ করে মালতী, কুড়াইয়া পাওয়া চিংড়ি মাছ, তাও সংখ্যায় তেবোটা, ভাগ দেওয়া উচিত ছিল বটে। কিন্তু সুশান্তের মা নিশ্চয় জানেন ভাগ দেওযা না দেওযার মালিক সে নয়। একটু আমতা আমতা করিয়া মালতী বলে, একটা মাছ এনে দেব মাসিমা ? দিই না, অ্যাঁ ?

ভয়ে বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করে। যদি রাজি হইয়া যান সুশান্তের মা, যদি সস্নেহে হাসিয়া বলেন, দিবি, আচ্ছা দে ! তারপর বউদি যদি সুশান্তর মাকেও একটা চিংড়িমাছ ভাগ দিতে রাজি না হয়, তার স্বামীর কুড়াইয়া পাওয়া চিংড়ি মাছ ? ভাগাভাগি বউদি ভালোবাসে না। সে মেয়েমানুষ বটে, কিন্তু এ বিষয়ে স্বভাবটা দুর্যোধনের মতো।

কারণ-না-জানা মমতাটুকুর জন্যই সুশান্তর বোয়াকে দাঁড়ানো। খাওয়ার সময় সুশান্তব মাকে সহানুভূতি জানাইয়া ফিরিবার সময় রোয়াকে তাকে না দেখিলে মালতী রাগ করে, এত বেশি রাগ করে যে সেদিন রাত্রে সে আর আসে না। অনেক রাত্রে ট্যাক্সি নিয়া ফিরিয়া আসিয়া বার কয়েক হর্নটা প্যাঁক প্যাঁক করিয়া শিবচরণ বাড়ির আর পাড়ার অনেকের ঘুম ভাঙায়। মালতী উঠিয়া দরজা খুলিযা দেয়, ভাত বাড়িয়া দেয়, শিবচরণ শুইয়া পড়িলে নিজেও শোয়, হর্নের প্যাঁক প্যাঁক শব্দে যাদের ঘুম

ভাঙিয়াছিল তাদের মতো আবার সে ঘুমাইয়া পড়ে কিনা ভগবান জানেন, কিন্তু আর উঠিয়া আসে না। দামি প্যাডে সস্তা কলমের আঁচড় কাটিয়া মাঝে মাঝে একটা দুটা সিগারেটের মেশাল দিয়া বিড়ি টানিয়া, বারবার রোয়াকে গিয়া নীচের অন্ধকার উঠানের দিকে চাহিয়া থাকিয়া রাত্রি জাগাই সুশান্তর সার হয়। কত করিয়া মালতীকে সে বুঝায়, কত বলে যে অমন মৃদু নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মালতী চলাফেরা করে, রোজ কি তার পক্ষে টের পাওয়া সম্ভব সে কখন উপরে আসিয়াছে, দু-একদিন সময়মতো রোয়াকে গিয়া না দাঁড়াইলে তার কি রাগ করা উচিত ?

মালতী বুঝিয়াও বোঝে না।

পায়ের আওয়াজ নাই বা পেলে, আমি ওপরে আসি মাসিমা যখন খেতে বসেন তখন।

মা কখন খেতে বসে জানব কী করে ?

খেয়াল রাখলেই জানা যায়। তোমাদের খাইয়ে তবে মা ফেলা-ছড়া যা থাকে নিয়ে—

আলাপ আলোচনার এদিকটা সুশান্ত এড়াইয়া যায়। গভীর ক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে বলে, তুমি কিছু বোঝ না। লিখতে বসলে আমার কী কিছু খেয়াল থাকে, না খেয়াল থাকলে লেখা যায় ? নিজে যদি লিখতে তাহলে বুঝতে মানুষের গভীর মনের সুখদুঃখের রূপ দিতে হলে বিশ্বসংসারকে ভুলে যেতে হয়। তুমি বুঝবে না মালতী, বুঝবে না।

অন্য সকলের মতো, জীবনযাত্রার ক্ষোভও এক সুরে বাঁধা। ক্ষোভের জ্বালায় মাথাব মধ্যে পর্যন্ত যেন ঝিমঝিম করে, মাথা নাড়িয়া জোর দিয়া সে বলে, বুঝবে না, বুঝবে না, তুমি বুঝবে না মালতী।

মালতী অবশ্য দরদের সঙ্গেই বলে, মানুষ যা বোঝে না মানুষকে তা বোঝাবার দরকাব ? কিন্তু মালতী তো বোঝে না এক ধরনের মানুষ আছে জগতে এক ধরনের দরদের সঙ্গে এক ধরনের রূঢ় কথা বলিলে যাদের স্নায়ুগুলি ফাঁসির আসামির মতো আড়ষ্ট হইয়া যায়—মনে হয় জীবন-কাহিনির শেষ পরিচ্ছেদের শেষ পৃষ্ঠা আসিয়া গিয়াছে জীবনটার মাঝামাঝি।

আসলে নিন্দা-প্রশংসার কথা নয়, বোঝা না বোঝার প্রশ্ন নয়, অন্য মানুষকে খুন করিয়া ক্রমাগত ফাঁসিকাঠে আত্মহত্যা করিতে গেলে ক্ষোভ জাগিবেই। অনাবৃত বিবর্ণ কাঠের টেবিলে দামি প্যাড পাতিয়া সস্তা কলমের সাহায্যে একটা আন্তর্জাতিক মহাযুদ্ধে যত বাছা বাছা লোক মরে তার চেয়ে বেশি লোক মারিবার ফন্দি আঁটিতে থাকিলে এ বিপদটা অবশ্যম্ভাবী। মাথায় লাঠি মারিযা এ যন্ত্রণার অবসান করিবার যদি কেউ থাকিত, ছাদটা হুড়মুড় করিয়া মাথায় ভাঙিয়া পড়িবার সম্ভাবনা যদি থাকিত, অন্তত শকুন্তলাকে পাশে নিয়া যারা গাছতলায় ঝোপের আড়ালে ঝরাপাতা আর মরা ফুলের শয্যার উদ্দেশ্যে সত্যসত্যই উধাও হইতে জানে এবং পারে তাদের মধ্যে একজনও যদি সজোরে হর্ন টিপিয়া বীভৎস প্যাঁক প্যাঁক শব্দে সতর্ক করিয়া দিতে দিতে মাডগার্ডের ধাক্কায় বিশ-পঁচিশ হাত তফাতে গাছতলায় ঝোপের আড়ালে ঝরাপাতা আর মরা ফুলের শয্যায় ছিটকাইয়া দিত, ক্ষমতা থাকিলে গালাগালি দিবার ছলে সুশান্ত তাকে আশীর্বাদ না করিয়া ছাড়িত না।

মোট কথা, মালতীর ফিরিয়া যাওয়ার সময় রোয়াকে না দাঁড়াইয়া থাকিলে মালতী আর ফিরিয়া আসে না।

সুশান্ত বাবাকে গিয়া বলে, মোটর ড্রাইভিং শিখব বাবা ?

শিবনেত্র হইয়া তামাক টানাটা অনাথবন্ধুর স্বভাব। মুখের দিকে না চাহিলে বোঝা যায় না তার গাম্ভীর্য আসলে জড়বস্তুর প্রাণহীন আলস্যের নকলনবিশি। তবু মানুষটা তো জীবন্ত, রোজ আপিস যাতায়াত করেন। তাই ছেলের প্রস্তাবে থতোমতো খাইয়া রাগিয়া উঠিতে পারেন।

যা শেখ গে মোটর ড্রাইভিং—দূর হয়ে যা।

মোটর ড্রাইভিং শিখিবে। ছোটোছেলের খেলনার মোটরের মধ্যে যেটুকু বাস্তবতা আছে তার সঙ্গে পরিচয় করিতে যার দম বন্ধ হইয়া আসিবে, সে শিখিবে মোটর ড্রাইভিং, সে করিবে মোটর হাঁকাইয়া অর্থোপার্জন। তা ছাড়া ভদ্রলোকের ছেলে অর্থোপার্জন করিয়া মোটর হাঁকায়, মোটর হাঁকাইয়া অর্থোপার্জন করে না। কষ্ট কবিয়া মোটর ড্রাইভিং শিখিবার কী দবকার, রিকশা টানুক না সুশান্ত ? একই কথা, তাতেও পয়সা আসিবে। অমন পয়সা রোজগারের মুখে আগুন !

রাগে আগুন হইয়া অনাথবন্ধু স্নান করিতে গেলেন, আপিসের বেলা তখন হয় নাই, সুশান্তর মার আপিসের রান্নাও শেষ হয় নাই। দেহে জল ঢালিলে মনের যে আগুন নিভিয়া যায়, অনাথবন্ধুর রাগটা সেই সাধারণ পর্যায়ের। স্নান করিয়া ঠান্ডা হইয়া বসিয়া ছেলেকে তিনি ডাকিলেন।

কোথায় শিখবি মোটর ড্রাইভিং ?

স্কুল আছে, মোটর ড্রাইভিং-এর সঙ্গে মেকানিকাল ট্রেনিংও দেবে, ছয় মাসের কোর্স।

অনাথবন্ধু আবার থতোমতো খাইয়া রাগিয়া উঠিলেন।

মাইনে দিয়ে শিখবি ? স্কুলে ? তোব যত সব উদ্ভট খেয়াল।

তিনমাসেবও একটা কোর্স আছে বাবা, মাইনে বেশি নয়।

না না, ওসব মোটর ড্রাইভিং শিখতে হবে না। একদিন আলু আনতে দিলে যে পাকা পটল কিনে আনে তার আবার মোটব ড্রাইভিং। মানুষ চাপা দিয়ে জেলে যাবি তো শেষে।

আজ সকালেই বাজারে আলু কিনিতে গিযা সুশান্ত পটল কিনিয়া আনিয়াছিল, পাকা শুকনো পটল। বাপের যুক্তিটা তাই অস্বীকার কবা গেল না।

তবে শিবচরণের কাছে শিখিতে বাধা নাই। মোটর চালনায তালিম দিতে শিবচরণের আগ্রহই দেখা গেল, খুঁতখুঁত করিল সে অন্যদিকে। পথের বাস্তবতার ছাপ মারা কর্কশ মুখের চামড়া খোঁচ করিয়া, কলহ কলরবে মজবুত কণ্ঠস্বরকে ভদ্র করিবার চেষ্টা করিয়া ভয়ে ভয়ে সে বাববার বলিতে লাগিল, চাকরি বাকরি না করিয়া এ সব কেন ?

আমি ভাবলাম শখ করে শিখতে চান, নইলে গাড়ি চালানো শিখে আপনার দবকাবটা কী দাদা, অ্যাঁ ? একি ভদ্দরলোকের কাজ, এতে কি আর পয়সা আছে ? শিবচরণ ভীত চোখে চাহিয়া থাকে, আহা রোগা দুর্বল বোনটাকে ভদ্রলোকেব হাতে দিবার কল্পনা কি তার শেষ হইযা গেল।

সুশান্ত বলে, চাকরির চেয়ে তো পয়সা বেশি আছে

কে বললে আছে, ও সব আজগুবি কথা মশাই, না জেনে অমন সব বলে। এগাবো বছর এ লাইনে আছি, আমি জানি না ভিতরকার খবর ? উপায় থাকলে আমি তো দাদা একটা দিন গাড়ি হাঁকাতাম না। অর্ধেক খাটনির দাম উঠে না, মানুষ এ লাইনে আসে !

পরম ক্ষোভের চরম আঘাতে যে ঝোঁক চাপিয়াছে, শিবচরণের উপদেশে সেটা যাইবাব নয়। কোনোদিন সকালে কোনোদিন বিকালে শিবচরণের সঙ্গে সুশান্ত বাহির হইযা যায়, প্রথম মোটব গাড়ি চড়িবার আরামে গাড়ি চালানোব সহজ ধরাবাঁধা কৌশলগুলিও একরকম কিছুই শেখা হয় না। শিখিবার ঝোঁকটা কিন্তু সমান থাকিয়া যায়। কয়েকদিন পরেই শখটা তার মিটিয়া যাইবে, ভদ্রত্বেব স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবার জন্য আর সে আবদার ধরিবে না,— শিবচরণের এই আশাটা যেন সফল হইবে না মনে হয়।

সুশান্ত বলে, এমন কী মন্দ রোজগার ? বেশ তো আরামের কাজ।

শিবচরণ বলে, শুনুন একটা কথা বলি আপনাকে। এ সব কাজের জন্য একটু কাটখোট্টা শক্ত শরীর দরকার হয়, আপনার কি জানেন তেমন জোরালো শরীর তো নয়, মানে ভদ্রলোকের দেহ তো আপনার, এ সব কাজ আপনার পোষাবে না।

শিবচরণ অবশ্য দরদের সঙ্গেই কথাগুলি বলে, কিন্তু মালতীর মতো সেও বোঝে না এক ধরনের মানুষ আছে জগতে এক ধরনের দরদ দিয়া এক ধরনের রূঢ় কথা বলিলে যাদের স্নায়ু ফাঁসির আসামির মতো উত্তেজিত হইয়া উঠে ! আর সে উত্তেজনা কাজে না লাগায় বড়ো কষ্ট পায়।

এক মাস সুশান্ত ধৈর্য ধরিয়া খেয়ালমাফিক মোটর চালানো শেখে। মন দিয়া উৎসাহের সঙ্গে শেখে, কিন্তু এক মাসে অভিজ্ঞতা জন্মে যেন মোটে একদিনের। পথের বাস্তবতা ধুলাবালি আবর্জনার চেয়ে নোংরা, অসংখ্য মানসিক ব্যাধির বীজাণুতে বোঝাই। শিবচরণের মতো অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পাকা যোদ্ধাকে সম্মুখে রাখিয়া একরকম দর্শক হিসাবেই সুশান্ত জীবনের এই প্রকাশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে নামে, তবু এক মাসেই হৃদয় মন ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়। ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না—একটা আদর্শ টিকে না, একটা থিয়োরি খাটে না, একটা শখ বা সংস্কার স্থায়ী প্রশ্রয় পায় না, এ কোন জগৎ ? সেই বা এতদিন এমন কীসের আড়ালে বাস করিয়াছে যে পথে ভাড়াটে মোটরে ভাড়াটের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ানোকে বাঘভাল্লুক দৈত্যদানবের ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে অবিরাম ছুটিয়া পালানোর মতো মনে হয়। তার বাড়িতে পথের বাস্তবতা চিরদিন ছিল, এখনও আছে, পায়ে পায়ে পথেব ধুলা যেমন অন্তঃপুরে প্রবেশ কবে, তেমনিভাবে পথের বাস্তবতা মনে মনে প্রতিদিন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে, পথের ধুলার মতো এই বাস্তবতাকেও তাই ঝাঁটাইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা দরকার হয়, সকাল- সন্ধ্যা ঘর ঝাঁট দিলেও যেমন আনাচেকানাচে পথের ধুলা থাকিয়া যায়, শত ব্যবস্থার মধ্যেও পথেব বাস্তবতাও তেমনই আনাচেকানাচে আশ্রয় খুঁজিয়া পায়। তবে চাহিয়া না দেখিলে চোখে পড়ে না। দেখিতে না জানিলে চাহিয়া দেখা যায না। শুধু অস্বীকার করিয়া যাওয়া চলে।

এক মাসে সুশান্ত এতখানি দার্শনিক জ্ঞান সঞ্চয করে। প্রশস্ত রাজপথে, আঁকাবাঁকা সরু গলিতে শিবচরণের মোটর চালানোর নির্ভয় নিশ্চিন্ত নিপুণতা আজকাল তাকে বড়ো ক্ষুব্ধ করিযা তোলে, সে বুঝিতে পারে এ ভাবে এ জীবনে এমন নিখুঁত মোটর চালানো সে আয়ত্ত করিতে পারিবে না। এমন কী শিবচরণের হাতে গাড়ির হর্ন যেমন বাজে, তার হাতে কোনোদিন সেভাবে বাজিবে না। কতবার কতভাবে সুশান্ত হর্ন বাজাইয়া দেখিয়াছে, প্রত্যেকবার মনে হইয়াছে সুব কাটিয়া গেল, আওয়াজটা জমিল না।

তবে একটা যা ব্যাপার ঘটে, সুশান্ত কোনোদিন কল্পনা করিতে পারে নাই।

মালতীর মৃদু, অসহায় একটানা আনন্দের মধ্যে হঠাৎ সে যেন একদিন ঢেউয়ের আবির্ভাব অনুভব করিতে পারে। জড় পদার্থ ছাড়া যতটুকু প্রাণের অস্তিত্ব আর কিছুর মধ্যেই বোধগম্য হইবার নয়, ততটুকু পুলকের আতিশয্যও মালতীর মধ্যে অসাধারণ। হাত ধরিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিযা মালতী বিস্ময়ের সঙ্গে বলে, এক মাস গাড়ি চালাতে না চালাতে হাতে ফোসকা পড়ে গেল ?

সুশান্ত কৈফিয়ত দিবার ভঙ্গিতে বলে, প্রথম প্রথম—

মালতী অধীর ব্যাকুলতার সঙ্গে বলে, পড়ুক, পড়ুক, ফোসকা পড়া ভালো—সমস্ত হাতে ফোসকা পড়ুক। বলিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে থাকে : বুঝবে না, বুঝবে না, তুমি বুঝবে না।

কারণে অকারণে মোটরের হর্ন বাজাইলেই হাতে চিরদিন ফোসকা পড়ে না—পথিককে সতর্ক করার জন্য কে তবে হর্ন বাজাইত, মোটরের জন্য অন্য ব্যবস্থা থাকিত। কিন্তু সুশান্ত স্পষ্ট বুঝিতে পারে, শব্দের অর্থ রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে। কাগজে যেভাবেই হর্ন বাজানোর কথা সে লিখুক, শকুন্তলা সঙ্গে সঙ্গে আগের মতো অভদ্রভাবে মনের মধ্যে বিচরণ করিতে ছুটিয়া আসে না। তাকে চেষ্টা

করিয়া আনিতে হয়। আনিলেও পরাশরের সত্যবতীর মতো তার জন্য কিছু কিছু কুয়াশা মনের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া রাখিতে হয়।

একমাস পরে তাই আবার একদিন সুশান্ত সস্তা কলমে কালি ভরে। দামি প্যাডের লেখা পাতাটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার লিখিতে আরম্ভ করে।

মোটর বললে, প্যাঁক।

হাঁস বললে, প্যাঁক।

মোটর থামিয়ে মাংস খেলাম। হাঁসটার মাংস শক্ত, কিন্তু শকুন্তলা চমৎকার রান্না করে। মাংসের গন্ধে অদূরের গাঁ থেকে গোটা দুই কুকুর এসে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগল। গাছতলার কাঁটাঝোপের আড়ালে ঝরাপাতা আর মরামুকুলের শয্যায় বসে তাদের নিঃশব্দ আবেদন দেখতে দেখতে মনে হল, বিধাতা তো শুধু শকুন্তলার অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই ভাষা দেননি ! বোবা কিছু সৃষ্টি করা কি বিধাতার ক্ষমতার বাইরে ?

বিষাক্ত প্রেম

মানুষের মনের মিল তো, যখন তখন যেমন তেমন অবস্থায় যার তার সঙ্গে অনায়াসেই হতে পারে। সত্য আর সরলার মনের মিল হতেও একমাসের বেশি সময় লাগল না। অপরে যেখানে বাদ সাধে না, মাথা ঘামানোও দরকার মনে করে না, সেখানে সেই মিলন হতে মনের মিলটাই সাধারণত যথেষ্ট, যে মিলনটা মনের মিলের স্বাভাবিক পরিণতি। মনের মিলই তো প্রেম। কিন্তু সত্য আর সরলার মনের মিলের জন্য প্রয়োজনীয় মিলনটা যেন তারাই নিষ্প্রয়োজনীয় বলে বাতিল করে রেখে দিল। পরস্পরকে না দেখে তাদের মন করতে লাগল কেমন কেমন, কিন্তু তারা কেউ টের পেল না যে একসঙ্গে বসবাস করতে আরম্ভ না করে তাদের আর উপায় নেই।

ঘটনাচক্রে মনের যে তাদের মিল হয়ে গেছে, সরলার চেয়ে এ বিষয়ে সত্যই যেন হয়ে রইল বেশি উদাসীন। একেই তো লোকটা সে একটু চাপা, তার উপর তার ব্যাবসা হল চুরি—সরলার ঘরে আসাযাওয়াও সে আরম্ভ করেছে একদিন সুযোগমতো তার গয়না আর টাকা নিয়ে পালাবার মতলবে। জীবনে কোনো কিছুর অভিব্যক্তি না হওয়াটাই সত্যর পরম কাম্য। যা কিছু হবার গোপনেই হোক, জীবিকার্জন থেকে জীবনযাপন পর্যন্ত। নিজের মনটা চুরি গিয়েছে জেনে নিজেকে ধন্য মনে করবার মানুষ সত্য নয়।

অবশ্য সরলার ঘরে প্রথম রাত্রে সে এসেছিল প্রচলিত মন-চোরার বেশে। মন-চোবার বেশটা কিছুদিন আগে সংগ্রহ করেছিল এক ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে। বাড়িতে পর্যন্ত চোরের ভয়ে ব্যবসায়ীরা কেন অতিরিক্ত সতর্ক হয়ে থাকে তারাই জানে, ব্যবসায়ীটির নিজের ঘরে সত্য সুবিধা করতে পারেনি। তার বিগড়ে যাওয়া ছেলেটার ঘর থেকে কেবল সংগ্রহ কবে এনেছিল রাত্রিচর বাবু সাজবাব সরঞ্জাম—ধুতি পাঞ্জাবি, সোনার ঘড়ি, সোনার বোতাম ইত্যাদি। একজোড়া নতুন জুতো কিন্তু তাকে কিনতে হয়েছিল। তবে জুতো কেনার পয়সাটা জুটেছিল ব্যবসায়ীর বিগড়ে যাওয়া ছেলেটারই মনিব্যাগে। কিন্তু যতই হোক, এমনিভাবে পরের মনিব্যাগ থেকে পয়সা রোজগার করাটা যখন সত্যব জীবিকার্জনের উপায়, হাতে আসা পয়সা খরচ করে দামি জুতো কিনতে হওয়ায় মনটা তার একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল বইকী। মোটামুটি বলা যায়, জামাকাপড়ের সঙ্গে মানানসই জুতো কেনার শখটাকে কাজে লাগাবার প্রয়োজনেই সে সরলার ঘাড় ভাঙবার মতলব ঠিক করেছিল। পায়ের জুতোর মৃদু মসমসানি আওয়াজ কানে এলে মনের মধ্যে কেবলই মৃদু আপশোশ আর অস্বস্তি জাগতে থাকবে, এ অবস্থার একটা প্রতিকারের ব্যবস্থা না করে মানুষ কদিন ঠিক থাকতে পারে ?

রূপ বলে সরলার কিছু নেই। এ একটা অতি বড়ো সম্পদ সরলার—অতি বড়ো আকর্ষণ। সবাই রূপসি বলবে এমন রূপ যার নেই, কয়েকজন রূপসি বলবে আর কয়েকজন কুরূপা বলবে এমন রূপও যার নেই, রূপ সম্বন্ধে কোনো একটা মতামত ঠিক করে ফেলবাব অপরিত্যাজ্য দায়িত্ব যে নারীকে দেখে কোনো পুরুষের পালন করবার প্রয়োজন হয় না, ভীরু পুরুষেরা তাকে ভারী পছন্দ করে। মেয়েমানুষ কেনা যেসব পুরুষের স্বভাব, তারা বড়ো ভীরু। সরলার গায়ে গয়না আর ঘরে আসবাব আছে তাই অনেক।

তবে গায়ের গয়না অধিকাংশই গিলটি করা, ঘরের আসবাব অধিকাংশই নিলামে কেনা। সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিস। আসল সোনার গয়নাগুলি সরলা রেখেছে লুকিয়ে, গায়ে রাখার চেয়ে লুকিয়ে রাখলে গয়না যে নিরাপদ থাকে এ খবর জানা থাকায় গায়ের গিলটি করা গয়নার জন্য তার কোনো

আপশোশ নেই। আসবাবগুলি তার আদায় করা উপহার—আদায় করা উপহার যে সাধারণত সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিস হয় এ খবরটাও জানা থাকায়, সেকেন্ড হ্যান্ড আসবাবের জন্যও তার কোনো আপশোশ নেই। তা ছাড়া, তিন পুরুষের একটা ভাঙা খাট আর উইয়ে ধরা আলমারিতে সাজানো স্বামীর ঘরখানার তুলনায় সাহেববাড়ির নিলামে কেনা আসবাবে সাজানো ঘরের শোভাই কি কম মনোহর ! খাটখানা সরলার নতুন—এই ঘরে মদ খেতে খেতে সাতবছর আগে যে লোকটা হার্টফেল করে মরে গিয়েছিল, তার স্নেহের দান। সরলার স্বাধীন জীবনে সেই প্রথম স্নেহ, সেই প্রথম আসবাব। তা হোক। সাতবছরে অনেক স্মৃতি উপে যায়, কিন্তু দামি খাট পুরোনো হয় না।

এই যে সত্য আর এই যে সরলা, কিছুদিন অযাচিতভাবে তারা পরস্পরকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল যে, একজনের জন্য অপরের মনে ঘৃণা নেই, বিদ্বেষ নেই, বিতৃষ্ণা নেই, বড়ো ভালো তারা, বড়ো সরল, আনন্দের নামে হইচই করতে তাদের পটুত্ব অসাধারণ, দুজনের মধ্যে মিল যা হয়েছে তার তুলনা নেই।

তারপর দুজনের হল মনের মিল।

কিন্তু কথাটা যতদিন মিথ্যা ছিল ততদিন বিশ্বাস করানো গিয়েছিল সহজেই, এখন কে এ কথায় বিশ্বাস করবে ? বিশ্বাস করিয়ে লাভও নেই, বিশ্বাস করবার উপায়ও নেই। সোজাসুজি মুখে বলে, আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশ করে, বড়ো বড়ো প্রতিজ্ঞা করে দেবদেবীর নামে দিব্যি কেটে জানালেও ফল হবে সেই একই। সত্যর লুকানো গয়না আবিষ্কারের ফন্দি-ফিকির-ফাঁদের মতো সরলাকে যেমন ফাঁপরে ফেলে রেখেছে তেমনি ফাঁপরেই ফেলে রাখবে, সরলার টাকা আর উপহার আদায়ের চেষ্টা সত্যকে যেমন বিপদগ্রস্ত করে রেখেছে তেমনি বিপদগ্রস্তই করে রাখবে। মনের মিল হোক বা না হোক, কারোর জন্য সোনার মায়া বিসর্জন দেবার ক্ষমতা যে সত্যর নেই, টাকার মায়া বিসর্জন দেবার ক্ষমতা যে সরলার নেই !

সরলা ভাবে, লোকটা যদি চোর না হত ! দাবিদাওয়া নিশ্চয় কিছু কমাতাম, আদরযত্নের পরিমাণ নিশ্চয় কিছু বাড়াতাম, বেশি বেশি সময় কাছে রাখবার নিশ্চয় খুব চেষ্টা করতাম। লক্ষ্মীছাড়া যে চোর বদমাশ।

সত্য ভাবে, ছুঁড়ি যদি ঝানু না হত ! ঘাড় ভাঙার মতলবটা নিশ্চয় বন্ধ রাখতাম, যা রোজগার করি নিশ্চয় সব এনে দিতাম, একটা বোঝাপড়া করে নিশ্চয় এখানে আস্তানা গাড়তাম। বজ্জাত যে পাকা কাবলিওয়ালি !

এইসব ভাবে আর দুজনেরই গা জ্বালা করে।

গা জ্বালা করে আর দুজনেই মনে মনে আপশোশ করে যে, আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়েছি বাবা, ভাবনায় চিন্তায় দেহ গেল।

আপশোশ করে আর সত্য ভাবে, যত শিগগির সম্ভব কাজটা হাসিল করে পালাবে।

আপশোশ করে আর সরলা ভাবে, আদায়ে একটু ভাটা পড়লেই লোকটাকে তাড়াবে।

একদিন বিকাল বিকাল হাজির হয়ে সত্য বলে, কতগুলো টাকা পেয়েছি সরলি, আজ একটু ফুর্তি করা যাক, অ্যাঁ ?

সরলা খুশি হয়ে বলে, কত টাকা পেয়েছিস ? কোথায় পেলি ?

এক চোখ বুজে সত্য মুখের যে ভঙ্গি করে তার তুলনা নেই, পেলাম।

জগতে পাওয়াটাই সত্য। কী উপায়ে কোথায় কী পাওয়া গেল তার বিচার করতে বসে কেবল তার্কিক। সরলা তাই খুশিতে গদগদ হয়ে বলে, জেলে যাবি বাপু তুই একদিন।

বিপদ মাথায় করে উপার্জন করে এনে পুরুষ যখন হাতে তুলে দেয়, তখনকার মতো দুর্বল মুহূর্ত মেয়েমানুষের জীবনে আর কখন আসে ? সরলা গদগদ হয়েছে টের পেয়ে সত্যও গদগদ হয়ে বলে, যাই তো যাব জেলে, তোর জন্য যাব তো ?—বয়ে গেল !

সরলা আরও গদগদ হয়ে বলে, ইস্ !

শুনে মনটা সত্যর যেন গলে যাবে মনে হয়। বিবেককে জ্ঞান হয়ে অবধি প্রশ্রয় দেয়নি, তবু কী যেন কামড়ায়। কামড়ায় অবশ্য সেই সাপের মতো, যে সাপ কোনো অঙ্গে ছোবল দিলেই সেই অঙ্গটা হয়ে যায় অবশ।

তাই মুখখানা বিমর্ষ করে সত্য বলে, এক কাজ করি আয় আজ, একটা বড়ো বোতল এনে রেখে বায়স্কোপ দেখতে যাই চল,—ফিরে এসে ফুর্তি জমানো যাবে। ভালো করে সাজিস কিন্তু, সবাই যেন হাঁ করে চেয়ে থাকে তোর দিকে।

আশমানি রঙের শাড়িটা পরব ?

এই জটিল সমস্যার সমাধান করতে সত্যকে একটু ভাবতে হয়।

বেগুনিটা পরলে হত না ?—আচ্ছা পর, আশমানিটাই পর। বেগুনি আর আশমানি দুটোর যেটাই পরিস, এমন দেখায় তোকে মাইরি—সত্যি যেন তুই কার বউ।

ইস্ !

সত্য হাই তুলে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে বলে, গয়নাগুলো বদলাস কিন্তু—গিলটি দেখে লোকে হাসবে, আমার কিন্তু লজ্জা করবে।

এ সমস্যাটা সত্যসত্যই জটিল। সরলা কিন্তু চোখের পলকে মীমাংসা করে বলে, তুই বুঝি ভাবিস গিলটি পরে যেতে আমার লজ্জা হয় না ? যা না, টিকিট কেটে আনগে না তুই, আমি এদিকে বোতল-ফোতল আনাই, সেজেগুজে ঠিক হয়ে থাকি।

সত্য সাত বছরের নতুন খাটে চিত হয়ে শুয়ে বলে, টিকিট কাটতে যাব কি, চার আনার টিকিট তো নয়। দুজনে একবারে গিয়ে টিকিট কাটব।

কিন্তু এ ফিকিরও তার সার্থক হয় না, কখন কোন ফাঁকে সরলা আসল সোনার গয়নাগুলি গোপন স্থান থেকে বার করে আনে সত্য টেরও পায় না। মুখখানা তার গম্ভীর হয়ে যায়।

তবু, সরলভাবেই জিজ্ঞাসা করে, কখন বদলালি গয়না ?

এই তো মাত্তর।

সত্যর বিস্ময় যেন সীমা ছাড়িয়ে যায়।

এই মাত্তর !—কোথায় ছিল রে ?

আদায়-করা উপহার নিলামে-কেনা সেকেন্ড হ্যান্ড আলমারিটার দিকে সোজা আঙুল বাড়িয়ে বিনা দ্বিধায় সরলা বলে, ওই আলমারিতে, আবার কোথা ?

এমন নিশ্চিন্ত, নির্বিকার তার জবাব দেবার ভঙ্গি এবং এমন স্পষ্ট জোরালো তার জবাব যে, এক বিষয়ে সত্য নিঃসন্দেহ হতে পারে। সরলার গয়না কোনোদিন আলমারিতে লুকানো ছিল না, ভবিষ্যতেও কোনোদিন থাকবে না।

রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে ইচ্ছা হয় বলে সত্য দাঁত বার করে হাসে। সরলাকে ধরে মারতে ইচ্ছা করে বলে তাকে বেশিরকম আদর করে। একেবারে চরম পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নেই জেনে মনটা যত তার ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে, রসিকতা করে ততই সে সরলাকে হাসায়। সিনেমা দেখিয়ে নিয়ে যায় দেশি ফিরিঙ্গি হোটেলে, পচা চপ আর দামি বিলাতি মদ খাওয়ায়।

সরলা বলে, ঘরেই তো ছিল, আবার এখেনে কেন ?

আজ একটু প্রাণ ভরে ফুর্তি করতে সাধ যাচ্ছে।

কেন, আজ কী ?

প্রশ্নের ভঙ্গিতে ক্ষীণ একটা সংশয়, মৃদু একটা ভয় ধরা পড়ে। সত্য সাবধান হয়ে বলে, অতগুনো টাকা রোজগার করলাম যে আজ ? বলে দাঁত বার করে হাসে না, সরলাকে আর বেশিরকম আদর করে না, বেশি বেশি রসিকতা করে হাসায় না।

ঘরে ফেরার কিছুক্ষণ পরে সরলা তাই জিজ্ঞাসা করে, হঠাৎ যে আবার মুখ ভার হল ?

প্রশ্নের ভঙ্গিতে ভয় ও সংশয় স্পষ্টতর প্রকাশ পাওয়ায় সত্য আবার সাবধান হয়ে বলে, না মাইরি না। মুখ ভার হয়নি।

জবাবটা স্বাভাবিক হওয়ায়, বড়োরকম কৈফিয়ত না থাকায়, একটু নিশ্চিন্ত হলে সরলা স্ফূর্তি জমানোর আয়োজন করে। বোতলের রসালো বিষে কখন কোন ফাঁকে যে সত্য কাগজের মোড়কের খানিকটা গুঁড়ো বিষ মিশিয়ে দেয়, সে টেরও পায় না। সত্যকে ফাঁকি দিয়ে লুকানো গয়না বার করতে সে যেমন পটু, ফাঁকি দিয়ে তাকে বিষ খাইয়ে দিতে সত্যও তার চেয়ে কম পটু নয়।

বিষে বিষক্ষয় হবার নিয়মটা এ ক্ষেত্রে বোধ হয় বাতিল হয়ে যায় এ জন্য যে বোতলের বিষকে লোকে সুধা বলে, মনেও করে তাই। মুখ বিকৃত করে সরলা বলে, থুঃ, কী খাওয়ালি আমাকে তুই ? কি বিচ্ছিরি স্বাদ !

সত্য অনুযোগ দিয়ে বলে, বললাম পচা চপ খাস না, তবু তুই খেলি। মর এবার !—নে, পান খা একটা। বলে সস্নেহে তার মুখে পান গুঁজে দেয়।

তারপর সরলা আরও খানিকটা বিষ পান করে আরও কাতর হয়ে বলে, গা কেমন করছে। মাথা ঘুরছে আর খাব না আমি।

সত্য আবার অনুযোগ দিয়ে বলে, বললাম পান খাস না, তবু তুই খেলি। মর এবার।—আয় মাথাটা টিপে দিই।

তারপর সত্যর কোলে মাথা রেখে সরলা ছটফট করে, গোঙায়, মুখে গাঁজলা তুলে মরে যাবার উপক্রম করে, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে সত্যর মুখের দিকে, দু হাতে সত্যকেই জড়িয়ে ধরে বিষক্রিয়ার হাত থেকে অব্যাহতি খোঁজে, অপমৃত্যুকে জয় করার চেষ্টায় সাহায্য চায়, আশ্রয় প্রার্থনা করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শিথিল, অবসন্ন নিঃশব্দে নিশ্চেষ্ট হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দেয় সত্যর হাতে, কিছু চেতনা কেবল থাকে চোখে আর চোখ দেখে মনে হয় ভেতরেও যেন একটা অদ্ভুত নির্বোধ চেতনার সৃষ্টি হয়েছে।

একেই বলে জীবনপাত করে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা। যার সঙ্গে মনের মিল হয়েছে তাকে মরণাপন্ন করে কিছু গয়না আর টাকা সংগ্রহ করা। বিবর্ণ পাংশু মুখে সত্য একে একে সরলার গা থেকে গয়নাগুলি খুলে নেয়, সরলার আঁচলে বাঁধা চাবির সাহায্যে লুকানো ও জমানো টাকাগুলি খুঁজে খুঁজে বার করে। কিন্তু সব সংগ্রহ করে পালাবার সময় বিষাক্ত প্রেমের বিষক্রিয়ায় সত্যর পাও যেন অবশ হয়ে আসে, মাথা ঝিমঝিম করে। বন্ধ দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে সে মুখ ফিরিয়ে তাকায়। সরলার পড়ে থাকার ভঙ্গি দেখে কার সাধ্য কল্পনা করে সে পাকা মেয়ে, জবরদস্ত কাবলিওয়ালি। তাড়াতাড়ি পালানোই ভালো, কিন্তু সত্য জানে, সমস্ত রাত এ ঘরে কেউ আসবে না, দরজা বন্ধ থাকলে কাল অনেক বেলা পর্যন্ত সরলার খোঁজ পড়বে না। মুখের গাঁজলা মুছিয়ে মাথায় একটু জল দিতে কতক্ষণ লাগবে ?

সরলার আশমানি রঙের শাড়ির আঁচলেই তার মুখ মুছিয়ে, মুখেচোখে জল ছিটিয়ে এবং অনেক যত্নে বাঁধা খোঁপা বাঁচিয়ে মাথার চুল ভিজিয়ে দিয়ে আর কতটুকু সেবা করা হয় ? চুরি করে

পালিয়ে যাবার সময় চোরের পর্যন্ত এইটুকু সেবা করে তৃপ্তি হয় না ! এমনই আশ্চর্য সেবা করার নেশা !

পাখা দিয়ে বাতাস করতে আরম্ভ করে সত্যর হঠাৎ মনে হয়, মরবার কথা নয় বটে, কিন্তু যদি মরে যায় ? সব বিষের ক্রিয়া তো সকলের ওপর সমান হয় না ! যে বিষে একজনের কিছুই হয় না, সেই বিষে অন্য একজনের মরে যাওয়া আশ্চর্য কী ? আর যদি জ্ঞান না হয়, সরলার অপলক চোখে আর যদি দৃষ্টি না আসে, বক্ষস্পন্দন যদি চিরদিনের জন্য থেমে যায় ? অনেকেই জানে সে সরলার সঙ্গে ছিল, খোঁজ তার পড়বেই। সরলাকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে পালালে পালাবার সময়টা সে একটু বেশি পাবে বটে, কিন্তু এই অবহেলার জন্য সরলা যদি মরে যায়, চোরের চেয়ে খুনিকে আবিষ্কার করার জন্য পুলিশের মাথাব্যথাও হবে সেই অনুপাতে বেশি। ধরা পড়লে চোরেব চেয়ে খুনির শাস্তিটাও চিরদিন বেশিই হয়ে এসেছে।

সত্য জানে সরলার কিছু হবে না, কাল অনেকবেলায় জ্ঞান হয়ে টাকা আর গয়নার শোকে সে যদি হার্টফেল না করে। যে বিষ যতখানি সরলার পেটে গিয়েছে তার তিনগুণ বিষ পেটে গেলেও সরলার কিছু হবে না, কিন্তু যদি হয় ? খুব কি দুর্বল নয় সরলা, খুব নির্জীব ? আজ পর্যন্ত যত মেয়েমানুষ সে দেখেছে, তাদের সকলের চেয়ে প্রাণশক্তি কি সবলার কম নয় ? এমন কোমল এমন অসহায় জীব জগতে আছে ?

ভয়ে সত্যর বুকের মধ্যে মোচড় দিতে থাকে, নিস্পন্দ সরলাব দিকে চেয়ে জগতে কারও যে মরবার কথা নয় সেই বিষটুকু সহ্য করবার মতো শক্তসমর্থ সবলা নয় কেন ভেবে ক্ষোভে তাব চোখে জল আসে। এত বেশি রাগ হয় যে, সরলার শিথিল অবসন্ন দেহটা বুকে তুলে তাকে পিষেই মেরে ফেলতে ইচ্ছা হয়। এতদিনের মতলব যে এমনিভাবে ফাঁস করে দেয়, সেই তাব উপযুক্ত শাস্তি। রাগটা খুব বেশি হয় বলে বুকে পিষে মেরে ফেলবার কথাটাই সত্যের মনে আসে, গলা টিপে মেরে ফেলবার সহজ উপায়ের কথাটা খেয়াল হয় না।

একে একে গয়নাগুলি সরলাকে পরিয়ে দিয়ে, তার টাকাগুলি যথাস্থানে লুকিয়ে রেখে, আঁচলে চাবিটা বেঁধে দিয়ে সে সরলার আরও জোরালো সেবা আরম্ভ করে দেয়। যে অবস্থা ফিরে এলে সে যে বাঁচবেই এ বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকবে না, সে অবস্থাটা ফিরে আসতে কাল বেলা হবে—মেয়ে কি সহজ ননীর পুতুল ! সত্য একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। এবার আর সুবিধা হল না। যাক কী আর করা যায়, চুরি কবার জন্য খুনি হবার বিপদটা তো ঘাড়ে করা চলে না। পরের বার অন্য ব্যবস্থা করবে—আর বিষটিষ নয়। কিছুদিন একসঙ্গে বসবাস কবলে, একদিন কি আর টের পাওয়া যাবে না সরলা গয়নাগুলি কোথায় লুকিয়ে রাখে ? যতদিন তা টের না পাওয়া যায়, ততদিন সে এমন ভাব দেখাবে যে সরলাকে ছেড়ে সে একদণ্ড থাকতে পাবে না, সরলার প্রেমে হৃদয় তার টইটুম্বুর !

দিক পরিবর্তন

মনোহরের এত পসার যে রোগীরা নাকি তার হাতে মরতেও ভালোবাসে। মনোহরের প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ির দোতলা আর তিনতলাটা বসবাসের কাজে লাগে, একতলায় বড়ো ডিসপেনসারি আর ওষুধের কারখানা। মনোহরের আবিষ্কৃত অনেকগুলি পেটেন্ট ওষুধ আছে। কতকগুলি রোগের পক্ষে উপকারী সর্বজনবিদিত সাধারণ কতকগুলি ওষুধের সঙ্গে আরও কতগুলি মানুষের পেট, রক্ত, স্নায়ু প্রভৃতির পক্ষে উপকারী ওষুধ মিশিয়ে যে সব পেটেন্ট ওষুধ সাধারণত তৈরি হয় আর অসংখ্য বিজ্ঞাপনের জোরে অসংখ্য রোগীর উদরে প্রবেশ লাভ করে, মনোহরের ওষুধগুলি সাধারণত সে রকম নয়। তার ওষুধে প্রকৃত যেটুকু গুণ আছে আর সে ওষুধ খেয়ে রোগীর যেটুকু উপকার হয় সেটা মনোহরের অনেকদিনের চিন্তা, পরিশ্রম ও পরীক্ষার ফল।

তাই পেটেন্ট ওষুধ মনোহরের একটু বিক্রি হয় কম। তবু তার অভাব বলতে কিছু নেই। তার নিজের স্বাস্থ্য ও চেহারা মন্দ নয় এবং চরিত্র ভালো। তার বউ যথাসম্ভব মোটা আর সুন্দরী। তার ছেলেমেয়ে দুটি কচি ও মিষ্টি। ঝি, চাকর, দারোয়ান, কম্পাউন্ডারে বাড়ি তার বোঝাই।

ওই যে ঝি, ওর নাম হল সখী। সখীর বয়স খুব কম এবং সে বিধবা। তার মনিব আছে কিন্তু মালিক কেউ নেই।

কিন্তু স্ত্রীলোকের—বিশেষত সখীর মতো বয়সের—আইনসঙ্গত মালিকের আসনটি শূন্য থাকলে আইন-অসঙ্গতভাবে সে শূন্য আসনটি দখলের চেষ্টা করার লোকের অভাব মোটেই হয় না। চাকর, ঠাকুর, দারোয়ান থেকে আরম্ভ করে ডিসপেনসারির কম্পাউন্ডারের পর্যন্ত সখীর সম্বন্ধে মনের বিকার।

ধর্ম থাকে মন্দিরে, চার্চে, মসজিদে—বিবেক থাকে হৃদয়ে। নীতিজ্ঞান সর্বত্রই ছড়ানো। তবু যে মানুষের, বিশেষত মেয়েমানুষের নীতিজ্ঞানকে শুধু জ্ঞানের ক্ষেত্রেই অনেক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকতে দেখা যায় তার কারণ একজন মানুষকে জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, আর একজন মানুষের নৈতিক জীবনের চতুঃসীমানায় গাঁথা দেয়ালটিকে খাড়া রাখতে হয়, 'কিছু'র জন্য নয়, আদমের আপেল খাওয়ার দিন থেকে 'কারো'র জন্য আমরা ভালো অথবা মন্দ অথবা মধ্যবিত্ত হয়ে থাকি।

সকলেই প্রলোভন দেখায় কিন্তু মনোহরকে সখী এত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে যে তার মাইনে করা চাকরের প্রলোভন সে অনায়াসেই জয় করে চলে। কম্পাউন্ডার একদিন একটি পাঁচ টাকার নোট সখীর আঁচলে বেঁধে দিতে গিয়েছিল, পারেনি।

অথচ, পাঁচটা টাকা সখীর একমাসের উপার্জন।

এমনিভাবে দিন যায়। মনোহর মনোযোগ দিয়ে রোগী দেখে, কম্পাউন্ডার ওষুধ তৈরি করে, চাকর দৈনিক বাজার থেকে বাঁচানো পয়সায় বড়োলোক হয়, ঠাকুর দুবেলা ভাত রাঁধে, দারোয়ান নিয়মিত গেট পাহারা দেয় আর সখী বাসন মাজে, কাপড় কাচে, গিন্নির ফাইফরমাশ খাটে। গিন্নি মোটরে চড়ে বেড়ান আর মোটা হন।

তারপর একদিন মনোহর দুপুরবেলা ফিরছে 'কল' থেকে, সারাদিন রোগী দেখে দেখে বেচারির মাথা খারাপ হয়ে গেছে ; সখী তখন কলতলায় স্নান করছিল। রান্নাঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে চাকর বিড়ি টানছিল, মনোহরকে দেখে সে সরে গেল।

সখীর দিকে চেয়ে মনোহর চমকে উঠল। সে যখন বাইরের রোদে ঘুরে ঘুরে তেতে পুড়ে সারা হয় তখন তারই বাড়িতে উঠোনের ভিজে ছায়ায় সখী চুল এলো করে দিয়ে মাথায় ঠান্ডা জল ঢালে এটা মনোহরের কাছে কেমন অসঙ্গত ঠেকল। তার এত তৃষ্ণা পেয়েছে যে সখীর চুলের সস্তা নারকেল তেল ধুয়ে যে জল গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে তাই পান করে সে অনায়াসে তৃষ্ণা মেটাতে পারে।

মনোহর অত্যন্ত চিন্তিত ও অন্যমনস্কভাবে স্নানাহার সম্পন্ন করল। বিকেলে সে আর রোগী দেখতে গেল না। সন্ধ্যার সময় গিন্নি আর ছেলেমেয়েদের সিনেমায় পাঠিয়ে দিয়ে সখীকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠাল। বলল, আমার ঘরে এক গ্লাস জল দিয়ে যাও সখী।

জল ? জলে কি মানুষের তেষ্টা মেটে ?

পরদিন দুপুরবেলা সখী ডিসপেনসারি ঝাঁট দিচ্ছে, কম্পাউন্ডার এসে তার হাত ধরে প্রথমে নিজের দিকে তারপর ডিসপেনসারির পাশে নিজের ঘরের দিকে আকর্ষণ করল। সখী বাধা দিল না। শুধু হাত পেতে মুচকে হেসে বলল, টাকা ?

রাত্রে তার বুদ্ধ দরজার সামনে মিনতি করতেই সে চাকরকে দরজা খুলে দিল। চাপা গলায় বলল, বাবু টের পেলে তোকে গুলি করে মারবে।

মশলা বাটছিল, ঠাকুর এসে চুপিচুপি বলল, একটা ঘর ঠিক করে এসেছি। রোজ একবার করে যাস।

ঝি মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল। মুখেও বলল, যাব।

বাড়ির কেউ তখনও ওঠেনি। বারান্দায় বসে চুল এলিয়ে দিয়ে সখী আপনমনে কাঁদছিল। দারোয়ান তখন নেংটি পরে মেহনত করতে আখড়ায় যাচ্ছে। ভেতরে এসে সে সখীকে জড়িয়ে ধরল।

সখী ক্লান্তস্বরে বলল, বাইরের দরজাটা বন্ধ করে এসো ছট্টু সিং। কেউ আসবে।

মাস ছয়েক পরে গিন্নি তাকে তাড়িয়ে দিলেন। সখীর ছেলে হবে।

ভদ্রলোকের বাড়িতে তো এত অনাচার চলতে পারে না।

মনোহর গোপনে সখীর হাতে শ-খানেক টাকা দিয়ে বলল, যে ঘরটা ঠিক করে দিয়েছি সেখানেই থেকো। ছেলেটাকে যত্ন কোরো, মাসে মাসে টাকা দিয়ে আসব।

সখী বলল, পাঠিয়ে দেবে না নিজেই যাবে গো ?

মনোহর একটু দ্বিধা করে জবাব দিল, আচ্ছা নিজেই যাব।

সত্যি ? বলে আড়ালে সখী চোখ মুছল।

মনোহর কদিন খুব মন খারাপ করে রইল। যতই হোক, সখী যে তার ছেলের মা !

কম্পাউন্ডারটির ছেলেমেয়ে হয়নি, বউ বাঁজা। সে ভাবল, আহা, সখী যদি আমার বউ হত ! দুদিন পরে ও আমার ছেলের মা হবে কিন্তু ছেলের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না !

ঠাকুর ভাবল, ইস্, ভারী অন্যায় হয়ে গেছে ! বংশে একটা ফ্যাকড়া রয়ে গেল। ছেলেটা যেন পেটেই মরে হরি !

চাকর কোত্থেকে একটা ওষুধের মোড়ক এনে বললে, খেয়ে ফ্যাল। ও ছেলে দিয়ে করবি কী ?

ঝি তার হাত থেকে মোড়কটা নিয়ে নর্দমায় ফেলে দিল।

দারোয়ান দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবল, বাঙালিনির গর্ভে তার না জানি কি কিম্ভূতকিমাকার ছেলেই হবে ! তাব অমন গৌরবর্ণ, একটুও বোধ হয় বাচ্চাটা পাবে না।

ছট্টু সিং একটা ভজন ধরলে।

নদীর বিদ্রোহ

চারটা পঁয়তাল্লিশের প্যাসেঞ্জার ট্রেনটিকে রওনা করাইয়া দিয়া নদেরচাঁদ নূতন সহকারীকে ডাকিয়া বলিল, আমি চললাম হে !

নূতন সহকারী একবার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

নদেরচাঁদ বলিল, আর বৃষ্টি হবে না, কি বল ?

নূতন সহকারী একবার জলে জলময় পৃথিবীর দিকে চাহিয়া বলিল, আজ্ঞে না।

নদেরচাঁদ লাইন ধরিয়া এক মাইল দূরে নদীর উপরকার ব্রিজের দিকে হাঁটিতে লাগিল। পাঁচদিন অবিরত বৃষ্টি হইয়া আজ এই বিকালের দিকে বর্ষণ থামিয়াছে। পাঁচদিন নদীকে দেখা হয় নাই। নদেরচাঁদ ছেলেমানুষের মতো ঔৎসুক্য বোধ করিতে লাগিল। আকাশে যেমন মেঘ করিয়া আছে, হয়তো আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবল ধারায় বর্ষণ শুরু হইয়া যাইবে। তা হোক। ব্রিজের একপাশে আজ চুপচাপ বসিয়া কিছুক্ষণ নদীকে না দেখিলে সে বাঁচিবে না। পাঁচদিনের আকাশ-ভাঙা বৃষ্টি না জানি নদীকে আজ কী অপরূপ রূপ দিয়াছে ? দুদিকে মাঠঘাট জলে ডুবিয়া গিয়াছিল, রেলের উঁচু বাঁধ ধরিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে দুপাশে চাহিয়া চাহিয়া নদেরচাঁদ নদীর বর্ষণ-পুষ্ট মূর্তি কল্পনা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ত্রিশ বছর বয়সে নদীর জন্য নদেরচাঁদের এত বেশি মায়া একটু অস্বাভাবিক। কেবল বয়সের জন্য নয়, ছোটো হোক, তুচ্ছ হোক, সে তো একটা স্টেশনের স্টেশন-মাস্টার, দিবারাত্রি মেল, প্যাসেঞ্জার আর মালগাড়িগুলির তীব্রবেগে ছুটাছুটি নিয়ন্ত্রিত করিবার দায়িত্ব যাহাদের সেও তো তাহাদেরই একজন, নদীর জন্য এমনভাবে পাগল হওয়া কি তার সাজে ? নদেরচাঁদ সব বোঝে, নিজেকে কেবল বুঝাইতে পারে না। নিজের এই পাগলামিতে যেন আনন্দই উপভোগ করে।

অস্বাভাবিক হোক, নদীকে এ ভাবে ভালোবাসিবার একটা কৈফিয়ত নদেরচাঁদ দিতে পারে। নদীর ধারে তার জন্ম হইয়াছে, নদীর ধারে সে মানুষ হইয়াছে, চিরদিন নদীকে সে ভালোবাসিয়াছে। দেশের নদীটি তার হয়তো এই নদীর মতো এত বড়ো ছিল না, কিন্তু শৈশবে, কৈশোরে, আর প্রথম যৌবনে বড়োছোটোর হিসাব কে করে ? দেশের সেই ক্ষীণস্রোতা নির্জীব নদীটি অসুস্থ দুর্বল আত্মীয়ার মতোই তার মমতা পাইয়াছিল। বড়ো হইয়া একবার অনাবৃষ্টির বছরে নদীর ক্ষীণ স্রোতধারাও প্রায় শুকাইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে দেখিয়া সে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল ; দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগিতে ভুগিতে পরমাত্মীয়া মরিয়া যাওয়ার উপক্রম করিলে মানুষ যেমন কাঁদে।

ব্রিজের কাছাকাছি আসিয়া প্রথমবার নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই নদেরচাঁদ স্তম্ভিত হইয়া গেল। পাঁচদিন আগেও বর্ষার জলে পরিপুষ্ট নদীর পঙ্কিল জলস্রোতে সে চাঞ্চল্য দেখিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে চাঞ্চল্য যেন ছিল পরিপূর্ণতার আনন্দের প্রকাশ। আজ যেন সেই নদী খেপিয়া গিয়াছে, গাঢ়তর পঙ্কিল জল ফুলিয়া ফাঁপিয়া ফেনোচ্ছ্বাসিত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। এতক্ষণ নদেরচাঁদ একটি সংকীর্ণ ক্ষীণস্রোতা নদীর কথা ভাবিতেছিল। তার চার বছরের চেনা এই নদীর মূর্তিকে তাই যেন আরও বেশি ভয়ংকর, আরও বেশি অপরিচিত মনে হইল।

ব্রিজের মাঝামাঝি ইট, সুরকি আর সিমেন্টে গাঁথা ধারকস্তম্ভের শেষপ্রান্তে বসিয়া সে প্রতিদিন নদীকে দেখে। আজও সে সেইখানে গিয়া বসিল। নদীর স্রোত ব্রিজের এই দিকে ধারকস্তম্ভগুলিতে

বাধা পাইয়া ফেনিল আবর্ত রচনা করিতেছে। এত উঁচুতে জল উঠিয়া আসিয়াছে যে, মনে হয় ইচ্ছা করিলে বুঝি হাত বাড়াইয়া স্পর্শ করা যায়। নদেরচাঁদের ভারী আমোদ বোধ হইতে লাগিল। পকেট খুঁজিয়া পুরাতন একটি চিঠি বাহির করিয়া সে স্রোতের মধ্যে ছুঁড়িয়া দিল। চোখের পলকে কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল চিঠিখানা ! উন্মত্ততার জন্যই জলপ্রবাহকে আজ তাহার জীবন্ত মনে হইতেছিল, তার সঙ্গে খেলায় যোগ দিয়া চিঠিখানা যেন তাড়াতাড়ি লুকাইয়া ফেলিয়াছে।

দুদিন ধরিয়া বাহিরের অবিশ্রান্ত বর্ষণের সঙ্গে সুর মিলাইয়া নদেরচাঁদ বউকে প্রাণপণে একখানা পাঁচপৃষ্ঠাব্যাপী বিরহ-বেদনাপূর্ণ চিঠি লিখিয়াছে, চিঠি পকেটেই ছিল। একটু মমতা বোধ করিল বটে, কিন্তু নদীর সঙ্গে খেলা করার লোভটা সে সামলাইতে পারিল না, এক একখানি পাতা ছিঁড়িয়া দুমড়াইয়া মোচড়াইয়া জলে ফেলিয়া দিতে লাগিল !

তারপর নামিল বৃষ্টি, সে কী মুষলধারায় বর্ষণ ! ঘণ্টা তিনেক বিশ্রাম কবিয়া মেঘের যেন নূতন শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে।

নদেরচাঁদ বসিয়া বসিয়া ভিজিতে লাগিল, উঠিল না। নদী হইতে একটা অশ্রুতপূর্ব শব্দ উঠিতেছিল, তার সঙ্গে বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ মিশিয়া হঠাৎ এমন একটা সঙ্গত সৃষ্টি করিয়াছে যে নদেরচাঁদের মন হইতে ছেলেমানুষি আমোদ মিলাইয়া গেল, তার মনে হইতে লাগিল এই ভীষণ-মধুর শব্দ শুনিতে শুনিতে সর্বাঙ্গ অবশ, অবসন্ন হইয়া আসিতেছে।

ক্রমে ক্রমে দিনের স্তিমিত আলো মিলাইয়া চারিদিক অন্ধকারে ছাইয়া গেল, বৃষ্টি একবার কিছুক্ষণের জন্য একটু কমিয়া আবার প্রবলবেগে বর্ষণ আরম্ভ হইল, ব্রিজের উপব দিয়া একটা ট্রেন চলিয়া যাওয়ার শব্দে আকস্মিক আঘাতে ঘুম ভাঙিয়া যাওয়ার মতো একটা বেদনাদায়ক চেতনা কিছুক্ষণের জন্য নদেরচাঁদকে দিশেহারা করিয়া রাখিল, তারপর সে অতিকষ্টে উঠিযা দাঁড়াইল।

বড়ো ভয় করিতে লাগিল নদেরচাঁদের। হঠাৎ তাহার মনে হইয়াছে, বোষে ক্ষোভে উন্মত্ত এই নদীর আর্তনাদি জলরাশির কয়েক হাত উঁচুতে এমন নিশ্চিন্তমনে এতক্ষণ বসিয়া থাকা তাহার উচিত হয় নাই। হোক ইট, সুরকি, সিমেন্ট, পাথর, লোহালক্কড়ে গড়া ব্রিজ, যে নদী এমনভাবে খেপিয়া যাইতে পারে তাহাকে বিশ্বাস নাই।

অন্ধকারে অতি সাবধানে লাইন ধরিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে নদেরচাঁদ স্টেশনেব দিকে ফিরিয়া চলিল। নদীর বিদ্রোহের কারণ সে বুঝিতে পারিয়াছে। ব্রিজটা ভাঙিয়া ভাসাইয়া লইয়া, দুপাশে মানুষের হাতে গড়া বাঁধ চুরমার করিয়া, সে স্বাভাবিক গতিতে বহিয়া যাইবার পথ করিয়া লইতে চায়। কিন্তু পারিবে কি ?

পারিলেও মানুষ কি তাকে রেহাই দিবে ? আজ যে ব্রিজ আর বাঁধ সে ভাঙিয়া ফেলিবে, কাল মানুষ আবার সেই ব্রিজ আর বাঁধ গড়িয়া তুলিবে। তারপর এই গভীর প্রশস্ত, জলপূর্ণ নদীব, তার দেশের সেই ক্ষীণস্রোতা নদীতে পরিণত হইতে না জানি মোটে আর কতদিন লাগিবে ?

স্টেশনের কাছে নূতন রং করা ব্রিজটির জন্য এতকাল নদেরচাঁদ গর্ব অনুভব করিয়াছে। আজ তার মনে হইল কী প্রয়োজন ছিল ব্রিজের ?

বোধ হয়, এই প্রশ্নের জবাব দিবার জন্যই পিছন হইতে ৭নং ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি নদেরচাঁদকে পিষিয়া দিয়া চলিয়া গেল ছোটো স্টেশনটির দিকে, নদেরচাঁদ চার বছর যেখানে স্টেশন-মাস্টারি করিয়াছে এবং বন্দী নদীকে ভালোবাসিয়াছে।

মহাবীর ও অবলার ইতিকথা

একটি ছেলে ছিল আর একটি মেয়ে। ছেলেটির নাম ধরা যাক মহাবীর আর মেয়েটির নাম ধরা যাক অবলা। কার কত বয়স, কে কোন ক্লাসে পড়ে, এ সব জেনে আমাদের দরকার নেই।

একদিন অবলা চোখ সজল আর বিস্ফারিত করে বলল, ছি !

শুনে মহাবীর ভয়ানক ভড়কে গেল। একবার ভাবল হাত বাড়িয়ে অবলার একখানা হাত ধরে। ভেবেচিন্তে সে ইচ্ছাটা ত্যাগ করে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, কেন, ছি কেন ? কীসের ছি ?

মাকে তুমি এমন করে অবহেলা কর !

সত্যসত্যই অবলার চোখ দিয়ে টপটপ করে ফোঁটা ফোঁটা জল মাটিতে ঝরে পড়তে লাগল। কোমল মন কিনা, কারও দুঃখকষ্টের কথা কানে এলেই মনটা গরমের দেশের বরফের মতো গলে যায়। অবশ্য সবচেয়ে বেশি গলে নিজের দুঃখকষ্টে ; ঠিক গরম তাওয়ায় বরফ দেওয়ার মতো, কিন্তু জীবনে এখনও দুঃখকষ্টের আবির্ভাব ঘটেনি বলে পরের জন্য মনটাকে একটু একটু না গলাতে পারলে অবলার দিন যেন কাটতে চায় না।

অবলার অভিযোগ মহাবীরকে আকস্মিক লজ্জায় প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত করে দিল। কেমন যেন বদলে গেল ছেলেটা। পোশাকের চাকচিক্য উঠে গেল, খরচের বাহুল্য কমে গেল, অতিরিক্ত আলস্যটা দরকারি বিশ্রামের চার ভাগের একভাগে এসে ঠেকল, না খায় সে আর সিগারেট, না যায় অবলাকে নিয়ে সপ্তাহে দুদিন সিনেমায়।

অনেক ভনিতা করে মাকে সে চিঠি লিখে দিল যে, মা, তোমায় আমি বড়ো বেশি অবহেলা করেছি, এই অধম সন্তানকে মাপ কর। বাকি জীবনটা আমি তোমার সেবা করে কাটিয়ে দেব।

বাকি জীবনটা আমি মার সেবা করে কাটিয়ে দেব অবলা।

অবলা তা ভালো করেই টের পেতে আরম্ভ করেছিল। মনে হল কী যেন একটা ঘূর্ণিপাকে পড়ে আজকাল তার মাথা ধরার আর কামাই থাকছে না। মুখটা দেখাচ্ছে পাংশু, শরীরটা দেখাচ্ছে রোগা, কথাবার্তা হয়ে গেছে ছাড়া ছাড়া। এমন একটা সাংঘাতিক ভুল কী সে করে বসেছে যার ফাঁদে পড়ে সারাজীবন ছটফট করতে হবে, এই কথাটা সব বয়সের স্ত্রীলোক অনেকবার ভাবে আর উতলা হয়। অবলা ঠিক সেইরকম ভাবে উতলা হতে আরম্ভ করেছিল।

একদিন তাই মহাবীরের সঙ্গে অতি সাধারণ বিষয়ে কথা বলতে বলতে আবার তার চোখ দিয়ে জল পড়তে আরম্ভ করল।

কাঁদছ কেন ?

হাতের ভাঁজে মুখ রেখে অবলা এবার রীতিমতো কান্না আরম্ভ করল।

মহাবীর ভয়ানক ভড়কে গেল। ভেবেচিন্তে অবলার একটি হাত ধরে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে অবলা, কাঁদছ কেন ?

অবলা কেঁদে কেঁদে বলল, তুমি কেবল মাকে নিয়ে মেতে আছ, আমার দিকে ফিরেও তাকাও না। আমি কি তোমার কেউ নই ?

কী সর্বনাশ, অবলার মুখে এই অভিযোগ—অবহেলার !

মহাবীরের হৃৎপিণ্ড যেন হঠাৎ কী একটা অজানা গ্যাস বেলুনের মতো ফেঁপে ফুলে উঠল। সত্যি, জীবনের কী শোচনীয় অপচয় ঘটেছে। অন্ধের মতো সোনার খনি থেকে সে কী ভাবেই শূন্য হাতে বিদায় গ্রহণ করেছে !

মহাবীরের পোশাকে আবার চাকচিক্য দেখা দিল, খরচের বাহুল্য বেড়ে গেল, আলস্যের অতুলনীয় আনন্দে দিনরাত্রি পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, একটা সস্তা দামের পাইপ কিনে টানতে আরম্ভ করে অবলাকে নিয়ে সপ্তাহে তিনদিন সে সিনেমায় যেতে আরম্ভ করল।

অবশ্য সে জন্য মাকে আধপেটা খেয়ে ছেঁড়া কাপড় পবে দিন কাটাতে হল, কিন্তু তার তো প্রতিকার নেই, তাই স্বাভাবিক।

অবলার মন খুঁতখুঁত করে, মাঝে মাঝে চোখে জলও আসে, মহাবীরের মুখের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে গালে হাত দিয়ে সে আকাশপাতাল ভাবে।

ভাবে : মহাবীরেরা কী হয় আকাশে ওঠে নয় পাতালে নামে, পৃথিবীতে থাকতে পাবে না ? এই মাটির পৃথিবীতে ?

দুটি ছোট্ট গল্প

বোমা

কাপড়ের দোকান থেকে সাতাশ টাকা দিয়ে স্ত্রীর জন্য একখানা কাপড় ও ব্লাউজ পিস কিনে অক্ষয় ফুটপাতে নেমেছে, এক ভিখারিনি এসে সামনে হাত পাতল।

তার বয়স বেশি নয়। তার দিকে তাকিয়ে অক্ষয়ের মনে হল, বয়স বেশি না হওয়ার জন্যই ভিখারিনির অসুবিধার সীমা নেই। পরনের কাপড়খানা তার মতো জীর্ণ। অনেক কৌশল করেও সে পুরোপুরি লজ্জা নিবারণ করতে পারেনি। পথের লোকের দৃষ্টিপাতে সংকুচিত হয়ে আছে।

বগলে স্ত্রীর জন্য সাতাশ টাকা দামের কাপড় ও ব্লাউজ পিসের কাগজের বাক্সোটার স্পর্শ অনুভব করে অল্পবয়সি ভিখারিনির দুর্দশা দেখে অক্ষয়ের মন কেমন করে উঠল। পকেট থেকে একটা সিকি বার করে সে ভিখারিনির হাতে দিল। তারপর ট্রামের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

দুদিকের ফুটপাত দিয়েই মানুষের সমান স্রোত চলেছে, ভিক্ষা দুদিকেই সমান পাবার সম্ভাবনা। তবু রাস্তা পার হয়ে ওদিকের ফুটপাতে যাবার কী দরকার ভিখারিনির হয়েছিল বলা যায় না। অক্ষয়ের চোখের সামনে সে একটা দ্রুতগামী মোটরের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে গেল।

একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড, বীভৎস দৃশ্য। কিন্তু অক্ষয় আহতা ভিখারিনির দিকে তাকাবার সময় পেল না। ভিখারিনির লজ্জা নিবারণে অক্ষম শতজীর্ণ কাপড়ের ভাঁজ থেকে যে একরাশি চকচকে টাকা রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছিল সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সেই দিকে।

পার্থক্য

দুটি দেওরের সেবাযত্ন করে বিধবা সুনীতির দিন কাটে। সুনীতির বয়স বছর তেইশ। বড়ো দেওর বিনয় তার সমবয়সি, বি এ পাশ করে জুটমিলে চাকরি করছে। বিয়ের জন্য সুনীতি সুন্দরী মেয়ে খুঁজছে, আগামী অঘ্রানের মধ্যে দেওরের সে বিয়ে দেবেই। ছোটো দেওর পাঁচুর বয়স বছর বারো। স্কুলে পড়ে।

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে চঞ্চলভাবে বাইরে আসতে গিয়ে চৌকাটে পা বেঁধে পাঁচু দড়াম করে একটা আছাড় খেল। সুনীতি ছুটে এসে তাকে তুলল। পাঁচুর খুব লেগেছিল। কোলে নিয়ে বসে আদর করে গায়ে হাত বুলিয়ে চুমু খেয়ে সুনীতি তাকে শান্ত করল।

পাড়ার সরকার গিন্নি একটু তেলের চেষ্টায় বসেছিলেন। বললেন, বেঁচে থাকো বউ, দেওর তো নয়, পেটের ছেলের বাড়া।

পাড়ায় সুনীতির সুখ্যাতি রটল। দেওরদের সুনীতি মার মতো স্নেহ করে, দিবারাত্রি দেওরদের জন্য খেটে খেটে তার জীবন বেরিয়ে গেল। সবাই বলল, হবে না ? লক্ষ্মী বউ যে !

কয়েকদিন পরে বিনয় জ্বর গায়ে আপিস থেকে বাড়ি ফিরল। জ্বর বেশি হয়নি, কিন্তু মাথার যন্ত্রণায় সে অস্থির হয়ে পড়েছে। সুনীতি তাড়াতাড়ি বিছানা করে দিল। বিছানায় শুয়ে বিনয় ছটফট করতে লাগল। সুনীতি বিছানায় বসে তার মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে মুখের দিকে ঝুঁকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করল, খুব কষ্ট হচ্ছে ভাই ?

বউ কইগো ? বলতে বলতে সরকার-গিন্নি উঁকি দিলেন, পরক্ষণে জিভ কেটে তাড়াতাড়ি গেলেন পালিয়ে। পাড়ায় ঢি ঢি পড়ে গেল। সবাই বলল, আ ছি ছি, এ কী অলক্ষ্মী বউ ?

সরীসৃপ

চারিদিকে বাগান, মাঝখানে প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ি। জমি কিনিয়া বাড়িটি তৈরি করিতে চারুর শ্বশুরের লাখ টাকার উপর খরচ হইয়াছিল। কিন্তু মোটে তিরিশ হাজার টাকার দেনার দায়ে এই সম্পত্তি চারুর হাত হইতে খসিয়া বনমালীর হাতে চলিয়া গিয়াছে।

প্রথম বয়সে চারু তার টনটনে বুদ্ধির সাহায্যে শ্বশুরের সম্পত্তির এমন চমৎকার বিলি ব্যবস্থাই করিয়াছিল যে, আত্মীয়-পর কেহ কোনোদিন কোনোদিক দিয়া তাহার একটি পয়সা অপচয় করিতে পারে নাই। কিন্তু বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও বিকারহীনতা বজায় রাখিতে চারুর তিনটি বিশেষ অসুবিধা ছিল। প্রথমত, আজীবন তাহাকে স্ত্রীলোক হইয়াই থাকিতে হইল। দ্বিতীয়ত, তাহার আধপাগলা স্বামী বিশ বছরের মধ্যে একদিনও প্রাণত্যাগ করিল না, অথচ এই বিশ বছরের প্রত্যেকটি মুহূর্ত বেশ ভালো মানুষের মতোই স্ত্রীর চরিত্রে ভয়ংকর সন্দিহান হইয়া রহিল। তৃতীয়ত, বয়স বাড়ার সঙ্গে চারুর একমাত্র পুত্রটিরও স্বাভাবিক বুদ্ধি বিকাশ পাইবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

শেষ জীবনে শ্রান্ত ক্লান্ত ও ভীরুতাগ্রস্ত চারু তাই সম্পত্তির সুব্যবস্থার নামে নানারকম মজা করিতে লাগিল। যেদিকে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই সেদিকে সে তার অতি-সাবধানী দৃষ্টিকে ব্যাপৃত রাখিল। আর যেদিকে সর্বনাশের পথ খোলা রহিল সে দিকটা লাভ করিল তাহার উদাসীনতা ; যাহাকে বিশ্বাস করার কথা, তাহাকে সে করিল একান্তভাবে অবিশ্বাস, আর যাহাকে জেলে দিয়া নিজেকে তাহার বাঁচানোই ছিল উচিত তাহার মতো বিশ্বাসী লোক সংসারে সে আর দেখিতে পাইল না।

ফলে চারুর যাহা রহিল তাহার নাম কিছুই না থাকা।

কোনো লাভ হোক বা না হোক সকলের সঙ্গে শুধু গায়ের জ্বালাতেই বিবাদ করিয়া তবে চারু হার মানিয়াছিল। বনমালীর সঙ্গে সে লড়াই করিল কিন্তু বিবাদ করিল না।

চারুর বিবাহ হয় সতেরো বৎসর বয়সে। বনমালী তখন পনেরো বৎসরের বালক মাত্র। চারুর শ্বশুর রামতারণ প্রত্যেক শনিবার বারাকপুরে গঙ্গার ধারে একটা বাগানবাড়িতে স্ফূর্তি করিতে যাইত। বনমালীর বাবা ছিল তাহার প্রতিবেশী, বন্ধু এবং মোসাহেব। তাহাদের ছোটো দ্বিতল গৃহের সামনে মোটর থামাইয়া, রামতারণ বনমালীর বাবাকে মোটরে তুলিয়া লইত। বনমালীকে হাসিয়া বলিত, বউমাকে পাহারা দিস বুনো।

হাসিয়া বলিলেও কথাটা পরিহাস নয়। নিজের পাগল ছেলের বউ বলিয়া নয়, স্ত্রীজাতির সতীত্বেই রামতারণ অবিশ্বাস করিত। কোথাও যাওয়ার আগে সে তাই বাড়িতে পাহারা রাখিয়া যাইত। কিন্তু রামতারণের বুদ্ধি ছিল। চাকর-দাসীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ব্যাপারটা প্রকাশ্য করিয়া দিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না। মোসাহেবের সরল ছেলেটাকে সে তাই বাড়িতে রাখিয়া যাইত এবং ফিরিয়া আসিয়া নানা কৌশলে নিজের অনুপস্থিতির সময় চারুর গতিবিধির ইতিহাস জানিয়া লইত। বনমালীর বাবা সবই বুঝিত কিন্তু কিছু বলিত না। হাসিত এবং কর্তব্যে অবহেলা করিয়া রামতারণের বাড়ি ছাড়িয়া মার জন্য মন কেমন করায় বনমালী নিজের বাড়ি চলিয়া আসিয়াছিল জানিতে পারিলে আচ্ছা করিয়া তাহার কান মলিয়া দিত।

চারুও বুঝিত, কিন্তু অবুঝের মতো তাহার রাগটা বনমালীর উপরে গিয়া পড়িত না। বনমালীকে সে যত্ন করিয়া খাওয়াইত, সারাদিন তাহার সঙ্গে গল্প করিত এবং রাত্রে নিজের শোবার

ঘরের পাশের ঘরখানায় তাহাকে বিছানা করিয়া দিয়া মাঝখানের দরজাটা খোলা রাখিয়া দিত। স্বামী গোলমাল করিলে সভয়ে বলিত, চুপ চুপ ! বাবার হুকুম। এবং রামতারণকে তাহার ছেলে এমনই যমের মতো ভয় করিত যে আর কথাটি না কহিয়া সে শান্ত শিশুর মতো ঘুমাইয়া পড়িত।

কয়েক বৎসর পরে রামতারণের মৃত্যুর পর এ ব্যবস্থা রহিত হইয়া গেল বটে কিন্তু বনমালীর যাতায়াত বজায় রহিল। যাতায়াত সে কমাইয়া ফেলিল অনেক বয়সে, শহরের ভিতরে একটা বাড়ি করিয়া উঠিয়া যাইবার পর।

আজ বিপদে পড়িয়া বনমালীকে অতিরিক্ত খাতির করিয়া কোনো সুবিধা আদায় করিবার চেষ্টার মধ্যে নানা কারণে চারুর যথেষ্ট লজ্জা ও অপমান ছিল। তবু একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া পাখা হাতে কাছে বসিয়া এমনই উত্তপ্ত সমাদরের সঙ্গেই বনমালীকে সে খাওয়াইতে বসাইল যে তাহাতে পাষাণও গলিয়া জল হইয়া যায়।

বলিল, ভগবান সুবুদ্ধি দিয়েছিলেন তাই বাগানবাড়ি তোমার কাছে বাঁধা রাখবার কথা মনে হয়েছিল, ভাই। আমার সর্বস্ব গেছে, যাক, কী আর করব ,—সবই মানুষের কপাল, মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকু যে রইল, এই আমার ঢের।

বনমালী একবার মুখ তুলিয়া চাহিল মাত্র। চারুর মাথার চুলের কালিমা ফ্যাকাশে হইয়া আসিয়াছে কেবল এইটুকু লক্ষ করিয়া আবার সে আহারে মন দিল।

আসল ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এইবার একটু মিঠা কথা বলা প্রয়োজন বোধ করিয়া চারু বলিল, নিরামিষ কপির ডালনা তোমার বোধ হয় ভালো লাগছে না, ভাই ?

বেশ লাগছে।

চারুর ছোটো বোন পরী এক মাসের ছেলে-কোলে কাছে বসিয়াছিল। এতক্ষণ কথা বলিতে না পারিয়া তার ভালো লাগিতেছিল না ! এইবার সুযোগ পাইয়া বলিল, এটা কিন্তু আপনি ভদ্রতা করে বললেন, বনমালী দাদা। ডালনা নিশ্চয় ভালো হয়নি। দিদিকে কত বললাম, আমি রাঁধি দিদি, আমি রাঁধি, দিদি কি কিছুতে আমাকে রাঁধতে দিলে !

চারু মনে মনে বিরক্ত হইয়া বলিল, না রেঁধেছিস বেশ করেছিস বাবু। ওইটুকু ছেলে নিয়ে রান্না করলে খেতে মানুষের ঘেন্না হত না ?

পরী উত্তেজিত হইয়া বলিল, ঘেন্না হত ! আমার রান্না খেতে বনমালীদাদার ঘেন্না হত, স্বয়ং বিধাতা এ কথা বললেও আমি বিশ্বাস করিনে দিদি !

চারু একটু হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, নে, না করিস না করিস। একটু চুপ কর। মানুষের সঙ্গে দুটো কথা বলতে দে।

আমিও কথাই বলছি।

চারু ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে বোনের দিকে তাকাইল। কুড়ি বাইশ হাজার টাকা খরচ করিয়া সে যে তাহার বিবাহ দিয়াছিল এমনি রাগের সময় সে কথাটা মনে পড়িয়া আজকাল চারুর মনের মধ্যে খচখচ করিয়া বেঁধে।

পরীর ছেলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। দিদি উপস্থিত থাকিতে বনমালীর কাছে আমল পাওয়ার সুবিধা হইবে না টের পাইয়া ছেলেকে শোয়ানোর প্রয়োজনটা এতক্ষণে সে অনুভব করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, অমন করে তাকাচ্ছ কেন দিদি ? মুখে কিছু লেগে আছে নাকি আমার ? বলিয়া বনমালীর দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া সে চলিয়া গেল।

চারু বলিল, দেখলে ভাই ? শুনলে মেয়ের কথাবার্তা ? আমি যেন ওর ইয়ার ! আর এই সেদিনও কেঁদে কেঁদে আমায় চিঠি লিখেছে, ও দিদি, আমাকে শপাঁচেক টাকা পাঠিয়ে দিয়ো দিদি ! টাকার বেলা দিদি দিদি, অন্য সময় সে কেউ নয়।

বনমালী বলিল, ছেলেমানুষ, বোঝে না।

বোঝে না ? হুঁঃ, কচি খুকি কি না, বোঝে না ! বোঝে সব, সব বুঝেও, এমনি করে, এ আর আমি টের পাইনে ! দিদির যে আর টাকা নেই, দিদি যে হুট বলতে পাঁচশো টাকা পাঠিয়ে দেয়নি !

বনমালী কিছু বলিল না। চারুও নিজের জ্বালা আর অভিমানে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

উহাদের স্তব্ধতা নিঃসম্পর্কীয়। কারণ আজ একজন প্রৌঢ়া নারী এবং অপরজন মধ্যবয়সি পাটের দালাল।

খানিক পরে চারু বলিল, যা বলছিলাম। ভাগ্যে এই বাড়ি আর বাগান তোমার কাছে বাঁধা রাখার কথা মনে হয়েছিল! টাকা দেবার মেয়াদ পার হয়ে গেছে বলে তুমি অবিশ্যি বাড়িটা নিয়ে নেবে না, কিন্তু আর কারও কাছে বাঁধা রাখলে কী সর্বনাশ হত বল তো !

তা বইকী। বাগানবাড়ি পরের হাতে চলে যেত। কিন্তু আমার কাছে বাড়ি তো তুমি বাঁধা রাখো নি চারুদি, বিক্রি করেছিলে।

ওমা, সে কী, ওই বাড়ি আমি বিক্রি করলাম কখন ?

বনমালী একটু হাসিয়া বলিল, দলিলের নকলটা একবার পড়ে দেখো। তিরিশ হাজার নগদ আর ওই টাকার ফাঁস বছরের সুদের দামে তুমি আমাকে বাড়ি বিক্রি করেছ। বরাবর সুদ দিয়ে এলে বলতে পারতে বাঁধা আছে।

মুখ পাংশু হইয়া যাওয়াটা চারু সম্পূর্ণ নিবারণ করিতে পারিল না। কী বলিবে হঠাৎ সে ভাবিয়া পাইল না। শেষে বলিল, তুমি হাসছ, তাই বল !

বনমালীর মুখের হাসি অনেক আগেই মুছিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে কিছু বলিল না। জীবনের একটা অভিজ্ঞতাকে বনমালী খুব দামি মনে করিয়া থাকে। তাহা এই যে, বক্তব্য দুবার মুখ দিয়া বাহির করিতে নাই। পুনরুক্তিতে কথার দাম কমিয়া যায়।

চারু আবার বলিল, আমি বলি কি, ত্রিশ হোক বত্রিশ হোক দেনা তো তোমার আমি শুধতে পারছি না, এ বাড়ি দিয়ে তুমিই বা করবে কী, তার চেয়ে বিক্রি করে ফেলে তোমার টাকাটা তুমি নিয়ে নাও, বাকিটা আমাকে দাও। তোমার তিরিশ হাজার কেটে নিলে আমার যা থাকবে তাই দিয়ে দেশে একটা ছোটোখাটো বাড়ি তুলে বাস করিগে। জমিজায়গা যা আছে দু-চার বিঘে তার খাজনা পাই না, ফসল পাই না, নিজে থাকলে একটা ব্যবস্থা হবে।

বনমালী খাওয়া বন্ধ করিল। আজকাল কোনো কিছুতেই সে বিস্ময় বোধ করে না, আকাশের একটা বজ্র পাখি হইয়া পাশ দিয়া উড়িয়া গেলেও না। কিন্তু চারুর কথায় সে যেন অবাক হইয়া গিয়াছে এমনই মুখের ভাব করিয়া বলিল, তুমি এ বাড়ি বিক্রি করতে চাও ? খেপেছ !

চারু সভয়ে বলিল, কেন ? তোমার টাকা তো তুমি পাবে !

আমার টাকা চুলোয় যাক।

চারু আরও ভয় পাইয়া বলিল, রাগ কোরো না ভাই। মেয়েমানুষ, কিছুই তো বুঝিনে !

বনমালী বলিল, ভুবনের বাড়ি বিক্রি করার পরামর্শ তোমাকে দিলে কে ? ও সব দুর্বুদ্ধি কোরো না। সময়টা, কী জান চারুদি, আমারও তেমন সুবিধে যাচ্ছে না। তোমার এই বাড়িটা বন্ধক রেখে কিছু ধার পেয়েছি। একটু সামলে উঠলেই ছাড়িয়ে নেব।

চারু রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিল, তারপর ?

ভুবনের বাড়ি ভুবন ফিরে পাবে।

গলনালী প্রায় রুদ্ধ করিয়া চারু বলিল, কিন্তু তোমার টাকা ? তোমার তিরিশ হাজার টাকা ?

ভুবনের কাছে জমা থাকবে !

এ কথা কেহ বিশ্বাস করে ! নির্মল আশার শোকে চারু কাঁদিয়া ফেলিল।

বনমালী বলিল, কেঁদো না চারুদি। আমি কি তোমার পর ? আগে তুমি আমাকে কত ভালোবাসতে।

শুনিয়া চারুর কান্না থমকিয়া থামিয়া গেল। বনমালী যদি পরিহাস করিয়া থাকে, বিশেষ করিয়া আগের কথা তুলিয়া পরিহাস করিয়া থাকে, তবে সত্যসত্যই আর কোনো আশা নাই।

আমি যদি তোমার মনে কোনোদিন ব্যথা দিয়ে থাকি, জেনো—

বনবালী আবার খাওয়া বন্ধ করিল।

তুমি আমার মনে ব্যথা দেবে কেন ?

চারু চোর বনিয়া গেল—যদির কথা বলছি।

বনমালী একেই গম্ভীর, সে আরও গম্ভীর হইয়া বলিল, ভুবন কোথায় চারুদি ?

চারু নিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিল, ও ভুবন, ভুবন। একবারটি এদিকে শুনে যাও তো, বাবা।

ঘরের ভিতর হইতে ভুবন থুপথুপ করিয়া পা ফেলিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সে অত্যাশ্চর্য মোটা। তাহার গলায় দুটি খাঁজ আছে, মনে হয় গালেও বুঝি খাঁজ পড়িবে।

বনমালী ভাবিল, এই ছেলেকে অত ভালোবাসে, চারু তো আশ্চর্য মেয়েমানুষ !

মাসখানেক পরে পরী শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল। বলিয়া গেল, আর আসব না দিদি।

আরও একমাস পরে বনমালী তার বুড়ো মা, আশ্রিত-আশ্রিতা, দাসদাসী ও মোটবহর লইয়া শহরের ভিতরের বাড়ি ছাড়িয়া চারুর শহরতলির বাড়িতে উঠিয়া আসিল। চারুর অনুমান করিতে কষ্ট হইল না যে বনমালীর অবস্থানটা সাময়িক হইবে না।

পাংশু মুখে সে জিজ্ঞাসা করিল, ওখানে কি তোমাদের অসুবিধে হচ্ছিল ভাই ?

বনমালী বলিল, অসুবিধে হলে এতদিন বাস করলাম কী করে, চারুদি ? সে জন্য নয়। মনে করছি, বাড়িটা আগাগোড়া মেরামত করব আর দু-খানা ঘর তুলব ছাদে। মাস দুই তোমার এখানেই আশ্রয় নিতে এলাম।

চারুকে বলিতে হইল, আহা আসবে বইকী, সে কী কথা, বেশ করেছ।

তারপর দুই মাসের মধ্যেও বনমালীর বাড়ি মেরামত আরম্ভ হইল না, ছাদে ঘর উঠিবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। চারু গোপনে সংবাদ লইয়া জানিতে পারিল, নিজের বাড়ি বনমালী দুইশত দশ টাকায় ভাড়া দিয়াছে। ইতিমধ্যে বনমালীর নিরঙ্কুশ তৈলাক্ত অধিকার সদরের গেট হইতে পিছনের গলিতে খিড়কির দরজা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া গেল। অতিথির আদর ও সম্মান পাইয়া চারু তার নিজের বাড়িতে বাস করিতে লাগিল।

বনমালী বলে, অসুবিধে হচ্ছে, চারুদি ?

প্রশ্ন শুনিলে রাগ হয় ।

না ভাই, অসুবিধে কিছু নেই।

কিছুদিন যদি দেশে গিয়ে থেকে আসতে চাও, কেষ্টকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পার। দেশেটেশে মধ্যে মধ্যে যাওয়া দরকার বইকী !

দেশে কী বাড়ি-ঘর-দোর কিছু আছে ভাই, যে যাব ?

হাজার দুই খরচ করলেই দেশে দিব্যি বাড়ি হয়। জমিজায়গা আছে, খাজনা পাও না, ফসল পাও না, সব লুটেপুটে নিচ্ছে ; নিজে থাকলে লোকসানটা বন্ধ হত।

জমি ! জমি কই দেশে ? কিছু কি আর আছে ভাই আমার, সর্বস্ব গেছে।

বনমালী তখনকার মতো চুপ করিয়া যায়।

তাহার মা হেমলতা বলেন, হ্যাঁরে, ওরা কি যাবে না ?

কোথায় যাবে ?

যে চুলোয় খুশি, আমাদের তা ভাববার দরকার ? কদিন দ্যাখ, তারপর নিজের পথ দেখে নিতে বলে দে।

তাড়িয়ে দিতে পারব না, মা। ও সব আমার ধাতে নেই। নিজে থেকে যায় তো যাবে, নইলে রইল।

কয়েকদিন পরে বনমালী আবার চারুকে বলে, শুনলাম, তুমি নাকি তীর্থে যেতে চাও ? আমায় বলনি কেন চারুদি ? আমি সব ব্যবস্থা করে দিতাম। তোমার ধর্মকর্মে আমি বাধা দেব কেন ?

বুদ্ধির ধার পড়িয়া গেলেও চারু এত বোকা হইয়া পড়ে নাই যে ভুবনকে লইয়া এ বাড়ি হইতে নড়িবে। বনমালীর দুর্বলতা সে জানে। বনমালী সোজাসুজি কাহারও প্রতি নিষ্ঠুরতা দেখাইতে পারে না। সামনে যে উপস্থিত থাকে তাহার মনে বেদনা দেওয়া বনমালীর সাধ্যাতীত। তার মনের চলাফেরার প্রস্তরময় পথে সে এক পরত মাটি বিছাইয়া ফুল ফুটাইয়া রাখিবারই চেষ্টা করে।

তীর্থদর্শন কামনা রাখার অপবাদ চারু তাই অস্বীকার করে। বলে, কই তীর্থে যাওয়ার কথা আমি তো কিছু বলিনি ? ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। মামিকে বলছিলাম, স্বামী শ্বশুরের এই তীর্থ ছেড়ে আমার এক পাও কোথাও নড়তে ইচ্ছে করে না। মাসিমা বুঝি মনে করেছেন, আমি তীর্থে যেতে চাই ?

বনমালী একটা হাই তোলে। মেয়েমানুষের এত বুদ্ধি তার ভালো লাগে না।

তবু, দেশ বেড়ালে ভুবনের একটু উপকার হত।

হায়রে কপাল, ওর আবার দেশ বেড়ানো !

চারু কাঁদাকাটা করার উপক্রম করে।

বনমালী আর কিছু না বলিয়া বাগানে পায়চারি করিতে যায়। ভাবে, কী আর হইবে, থাক। গ্রামকে গ্রাম ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়া বসিয়া আছে, চারুদির ভারটা আর এমন কী গুরু !

কাঁকর-বিছানো পথের ঠিক মাঝখান হইতে দুটি কচি সবুজ ঘাসের শীষ বাহির হইয়াছে দেখিয়া বনমালী থমকিয়া দাঁড়ায়। পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া যমজ ভাইয়ের মতো তাদের দুটিকে সে চাপা দিয়া দেয়। ভাবে, আগে চারুর যদি টাকা না থাকিত !

তারপর একদিন পরী বিধবা হইয়া দিদির কাছে চলিয়া আসিল। ছেলেকে সাবধানে মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে বলিতে লাগিল, দিদি গো, আমার কপাল পুড়েছে গো। কে অভিশাপ দিয়ে আমার এমন করলে গো, কে করলে !

গলায় আঁচল জড়াইয়া পাক দিয়া পরী গলায় ফাঁস দিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু হেমলতা ফাঁস খুলিয়া দেওয়ায় সে চেষ্টা সে ত্যাগ করিল। খানিকক্ষণ মেঝেতে কপাল কুটিয়া হাত কামড়াইয়া চেঁচাইয়া এক বিষম কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল ও ছুটিয়া নিজের ঘরে গিয়া দড়াম করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। গলায় সে যে আর ফাঁস দিতেছে না সেটা বেশ বুঝা গেল, কারণ বাহির হইতে ভগবানের কাছে তাহার একটানা আবেদন শোনা যাইতে লাগিল, আমায় নাও ভগবান, এবার আমায় নাও।

বনমালী পরীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, অমন করে কাঁদিসনে পরী ; ছেলের মুখ চেয়ে বুক বাঁধ। নে ওঠ, উঠে মাই দে ছেলেকে, ককিয়ে ককিয়ে গলা যে ওর কাঠ হয়ে গেল রে।

হেমলতা বনমালীর সান্ত্বনা প্রত্যাহার করিয়া নিলেন।

ওকে এখন ও সব বলিস নে বনমালী, কাঁদতে দে। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ওর শুনেছি যে দজ্জাল, প্রাণ খুলে সেখানে কী ও একটু কাঁদতেও পেরেছে রে ! এই প্রাণঘাতী শোক জোর করে চেপে রেখে শেষে কী অসুখে পড়বে মেয়েটা ? খানিক কেঁদে নিক।

পরী আরও জোরে কাঁদিয়া উঠিল। বনমালীর বিপদের আর সীমা রহিল না। কান্না তাহার একেবারেই সহ্য হয় না। অথচ উঠিয়া যাইবার উপায় নাই। পরী মনে করিবে, দ্যাখো কী নির্মম ; আমার এমন শোকটা চোখ মেলে একটু চেয়েও দেখলে না !

ওদিকে চারুর সাড়াশব্দ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। খানিক পরে দম নিয়া পরী বলিল, ও মাসিমা, দিদি কী করছে দেখুন।

হেমলতা খোকাকে বনমালীর দিকে আগাইয়া দিলেন।

ধর তো দেখেই আসি একবার।

বনমালী হাত বাড়াইল না।

আমি দেখে আসছি।

তুই এখানে বোস। পরীর ছেলেকে নিজের ছেলের কোলে এক রকম ফেলিয়া দিয়াই হেমলতা পলাইয়া গেলেন। খোকাকে সঙ্গে নিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহাকে আবার ফিরিয়া আসিতে হইত, সে ইচ্ছা হেমলতার ছিল না। এ সব তাঁহার ভালো লাগে না,—সদ্য বিধবার এই কান্নাকাটি। তা ছাড়া কুপিত বায়ুর প্রকোপে সর্বদা তাহার মনেব মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে, কোনো প্রকার উত্তেজনা হওয়া কবিরাজের নিষেধ। পবের মেয়ের কপাল পোড়ার ঝাঁঝে শেষে কী তাহার তালু জ্বলিবে !

চারুর ঘরের দরজা ঠেলিযা বলিলেন, দরজা খোলো মা, দরজা খোলো, ও সব কী করতে আছে ? মাথা ঠান্ডা রাখো।

বলিয়া ওদিকের জানালায় সরিযা গিয়া ঘবের ভিতরে তাকাইয়া তিনি অবাক হইয়া গেলেন। শরৎকালের ফাজিল মেঘের মতো চারুর শোক ইতিমধ্যেই কোথায় চলিয়া গিয়াছে। ভুবনকে আদব করিয়া সে তাহার মাথায় মাখাইতেছে কবিবাজি তেল।

হেমলতা চলিয়া গেলে পরী উঠিয়া বসিল। বনমালীর কাছে একা একা কাঁদিতে তাহার লজ্জা করে। মুখ হইতে এলোচুল সরাইয়া সে ভগ্নস্বরে বলিল, খোকাকে দিন, হাতটা বোধ হয় ওর ভেঙেই গেল।

খোকাকে তার কোলে দিয়া বনমালী বলিল, তোর ছেলেটা তো বেশ হয়েছে রে !

থাক, আপনাকে আর ঠাট্টা করতে হবে না।

বনমালীর দিকে পিছন করিয়া বসিয়া পরী খোকার মুখে মাই তুলিয়া দিল।

এবার বনমালী উঠিয়া যাইতে পারে, যাওয়াই সংগত ; কিন্তু সে বসিয়াই রহিল। পরীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বনমালীর চেতনা কোনোদিন বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ ছিল না। সে তার কাছে চিরদিনই চারুর ছোটো বোন। আজ বনমালী লক্ষ করিল যে বিধবার বেশ ধারণ করায় পরীকে কমবয়সি চারুর মতো দেখাইতেছে। তার ব্যবহার, তার মনোবিকার, তার কথা বলিবার ভঙ্গি যেন চারুর যৌবনকাল হইতে নকল করা। কেবল চারুর চেয়ে সে স্পষ্ট, স্বচ্ছ।

তোর ঘাড়ে কী লেগে আছে রে, পরী ?

ঘাড়ে হাত বুলাইয়া পরী জবাব দিল, কী লেগে থাকবে ? কিছু না।

তুই পাউডার মেখেছিস ?

পরী জোরে নিশ্বাস নিয়া বলিল, মেখেছিই তো, একশোবার মেখেছি। আপনি কেন আমায় কালো বলেন ?

পরীর বৈধব্যের আঘাতেই বোধ হয় চারুর মাথা আর একটু খারাপ হইয়া গেল। চল্লিশ বছর বয়সেই তাহার চুলে এবার পাক ধরিল, কোমরে বাত দেখা দিল আর পেটে হইল অম্বল। শোক আর অম্বলের

মধ্যে কোন কারণে তাহার বুক সর্বদা জ্বালা করিতেছে সেটা আর সব সময় ঠিকমতো বুঝিবার উপায় রহিল না।

হেমলতার কাছে সে কাঁদিয়া বলে, আমার মতো অবস্থা মাসিমা শত্রুরও যেন না হয়, দিনরাত ভগবানের কাছে এই কামনা জানাচ্ছি। কোনোদিকে কূলকিনারা নেই মাসিমা, আমি অকূলে ডুবেছি।

হেমলতা বিরক্ত হন। মুখে বলেন, মাথা ঠান্ডা রাখো।

মাথা চারু ঠান্ডা রাখিতে পারে না, ভাবিয়া ভাবিয়া মাথা গরম করে। একটা পেটের ছেলের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া যে আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, ছেলে নিয়া কচি বোনটাও আসিয়া ঘাড়ে চাপিল। সে কোনদিক সামলাইবে ?

পরীকে সে জিজ্ঞাসা করিল, কিছু রেখে গেছে ?

না।

কিছু না ? পোস্টাফিসে, ব্যাঙ্কে, তোর নামে কিছুই রেখে যায়নি ?

কী রোজগার করত যে রেখে যাবে দিদি ? মাস গেলে হাত খরচের টাকার জন্য বাপের কাছে হাত পাতত, রেখে যাবে !

আমি যা দিয়েছিলাম ?

শ্বশুরের সিন্দুকে ঢুকেছে—খাটপালঙ্ক ছাড়া।

চারু কপালে চোখ তুলিয়া বলিল, তোর গয়নাও দেয়নি নাকি ? তোকে যে আমি তেবো চোদ্দ হাজারের গয়না দিয়েছিলাম রে !

কিচ্ছুটি আমাকে দেয়নি দিদি, সব আটকে রেখেছে। আঁচল থেকে চাবি কেড়ে নিয়ে বাক্‌সো খুলে শ্বশুর নিজে সব বার করে নিল। খোকার গয়না পর্যন্ত।

এমন চামার ! তা, আর দুটো মাস তুই ধৈর্য ধরে থাকলি না কেন ? কেমন করে আদায় করে নিতে হয় আমি দেখতাম।

বড়ো খারাপ ব্যবহার করে দিদি, থাকতে ভালো লাগল না।

চারু হঠাৎ রাগিয়া উঠিল, থাকতে ভালো লাগল না ! মেয়েমানুষের অত ভালো লাগা মন্দ লাগা কি লো, যা, কালকেই ফিরে যা তুই,—বুড়ো মরবার সময় খোকাকে তো কিছু দিয়ে যাবে।

পরী ঠোঁট উলটাইয়া বলিল, আছে ছাই, দিয়েও যাবে ছাই। সাত ছেলের একটা রোজগার করে ? তাদের দিয়ে যেতে হবে না ? ও বাড়ি আমি আর যাচ্ছি না বাবু, হ্যাঁ।

চারু আগুন হইয়া বলিল, ছেলে তবে তোর মানুষ করবে কে শুনি ? তোকে খাওয়াবে কে শুনি ? আমি ! আমার আর সেদিন নেই পরী, বনমালী তাড়িয়ে দিলে নিজের ছেলে আমার খেতে পাবে না।

আমার ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না দিদি, বলিয়া মুখ ঘুরাইয়া পরী চলিয়া গেল।

চারু দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল, আমার ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না দিদি ! ভাবতে হবে না তো আমার বাড়িতে এসেছিস কেন লো হারামজাদি ?

তিনদিন পরীর সঙ্গে সে কথা কহিল না। কিন্তু তাহাতেও পরীর কিছুমাত্র অনুতাপের লক্ষণ নাই দেখিয়া চারুর নিজের হাত পা কামড়াইবার ইচ্ছা হইতে লাগিল।

দ্যাখ পরী, এত বাড় ভালো নয়।

নয় তো নয়, কী হবে ?

খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করিনি তোকে আমি ?

সবাই করে থাকে, তুমি একা নও।

চারু বনমালীর শরণ নিল।

মেয়েটা নিজের সর্বনাশ করছে ভাই। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এলে তাদেরই সুবিধে, একেবারে বঞ্চিত করবে।

বনমালী কাজের ভিড়ে ব্যস্ততার ভান করিয়া বলিল, আহা, যাবে বইকী চারুদি, যাবে। দুদিন জুড়িয়ে গেলে ক্ষতি কি ?

চারু আর কিছু বলিতে সাহস পাইল না।

পরদিন পরী মুখভার করিয়া বলিল, লেগেছ তো পেছনে ? জগতে কারও ভালো করতে নেই।

তুই আবার কবে আমার কী ভালো করলি লো ?

এখানে আছ কার জন্য ? ভেবে দেখেছ একবার ?

চারু চোখ পাকাইয়া বলিল, তোর জন্য, না ? তুই দয়া করে থাকতে দিয়েছিস !

তাই।

চট করিয়া ঘুরিয়া দমদম পা ফেলিয়া পরী চলিয়া গেল। চারু নিজের ঘরে গিয়া দেয়ালকে শুনাইয়া বলিতে লাগিল, ওর জন্য আমি আর কিছু করব না। করব না, করব না, করব না ; এই তিন সত্যি করলাম, নারায়ণ সাক্ষী।

পরীর ঔদ্ধত্য তার কাছে বেশিদিন অন্ধকার হইয়া রহিল না। ক্রমে ক্রমে ব্যাপারখানা বোঝা গেল।

বনমালীর খাওয়ার সময় চারু উপস্থিত থাকে, কয়েক দিন পরে পরীকেও দেখা যাইতে লাগিল। চারুর চেয়ে সে বনমালীর বেশি কাছ ঘেঁষিয়া বসে, চারুর হাতের পাখা আগেই দখল করিয়া রাখে, চারুর মুখের কথা কাড়িয়া নিয়া বলে, খান, পেট আপনার ভরেনি। কখ্খনো ভরেনি। আমি বুঝি না ! ওই খেয়ে মানুষ বাঁচে ?

বলে, কাল আপনাকে পেঁপের ডালনা রেঁধে দেব। খেয়ে দেখবেন বেশ রাঁধি।

চারু এমন করিয়া বলিতে পারে না, এমন স্নেহসিঞ্চিত গাঢ় কণ্ঠে, এমন মনোহর আবদারের ভঙ্গিমায়। অবাক হইয়া সে বোনের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে।

পরী বলে, হাঁ করে তাকিয়ে কি দেখছ দিদি ? দুধটা এনে দাও ! খাওয়া যে হয়ে এল, উঠে গেলে ভালো হবে ?

পরী যেন বনমালীর ছায়াটিকে বেদখল করিতে চায়। আশেপাশে কোথাও সে সর্বদা আছেই। বনমালীকে কখনও চুবুট খুঁজিতে হয় না, ওষুধ খাইতে ভুলিয়া যাইতে হয় না, দিনেব মধ্যে দু-চাব মিনিটের জন্য কারও সঙ্গে হালকা কথা বলিবার সাধ জাগিলে কেমন করিয়া টের পাইয়া পরী আসিয়া দাঁড়ায়, বলে, স্নান করতে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দেখে যাই আপনি কী করছেন।

রাত্রে বনমালী বিছানায় শুইলে চুপিচুপি ঘরে আসে।

বলে, কী চাই বলুন।

বনমালী হাসি গোপন করিয়া বলে, পা কামড়াচ্ছে—কেষ্টকে ডেকে দিয়ে যা। আর কিছু চাই না। পরী বলে, কেষ্ট কেন ? আমি কি পা টিপতে জানিনে ?

অবশ্য পা সে টেপে না, অত বোকা পরী নয় ; কেষ্টকেই ডাকিয়া দেয়। হুকুম দিয়া যায়, যাবার সময় আলো নিভিয়ে দিস কেষ্ট।

ছেলের দিকে চাহিবার সময় পরীর হয় না। ঝির কোলে পরীর ছেলে প্রায়ই মাতৃস্তন্যের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

বনমালীর চারিদিকে পরী যে বৃত্ত রচনা করিয়া রাখে তার পরিধির বাহিরে চারু পাক খাইয়া বেড়ায়, কোথাও প্রবেশের ফাঁক দেখিতে পায় না।

ভাবে, কী মেয়ে বাবা ! ও দেখছি সর্বনাশ করে ছাড়বে !

একদিন একটু বেশি রাত্রে খুব বাদল নামিয়াছে।

খানিক বর্ষণের পর অবিরত বিদ্যুৎচমক আর বজ্রপাত আরম্ভ হইয়া গেল ; প্রকৃতির সে এক মহামারী কাণ্ড।

চারু ভাবিল, অন্য ঘরে একা একা পরী বড়ো ভয় পাইতেছে।

উঠিয়া দরজা খুলিয়া সে বাহিরে আসিল। একটু খোঁজখবর নিলে পরী খুশি হইবে। বনমালীকে ও যেরকম বাগ মানাইয়া আনিতেছে ওকে একটু খুশি রাখা দরকার বইকী!

নিশুতি রাত, বাড়িটা এক একবার প্রাণঘাতী আলোয় চমকাইয়া উঠিয়া অন্ধকারে আড়ষ্ট হইয়া যাইতেছে। চারু পা চালাইয়া বারান্দাটুকু পার হইয়া গেল। কী জানি, একটা বজ্র যদি তাহার ঘাড়েই আসিয়া পড়ে।

পরীর ঘরের দরজা ভেজানো ছিল, ঠেলিতে খুলিয়া গেল। ঘরের মধ্যে দু-পা আগাইয়া চারু থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। এ দৃশ্য তাহাকে দেখিতে হইবে চারু তাহা কল্পনাও করে নাই। মেঘগর্জনে পরী ভয় পাইবে এ আশঙ্কা কয়েক মিনিটের জন্যও তাহার পোষণ করার প্রয়োজন ছিল না। পরী একা নয়। বনমালীর বুকের কাছে যদিও সে জড়োসড়ো হইয়াই তাহার কথা শুনিতেছে, সেটা ভয়ে নয়।

খোকার ছোটো বিছানাটি মেঝেতে নামানো, বিছানা হইতে গড়াইয়া বনমালীর এক পাটি জুতা দু হাতে বুকের কাছে আঁকড়াইয়া ধরিয়া খোকা শান্তভাবে ঘুমাইয়া আছে।

পা হইতে মাথা অবধি চারু একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করিল। একটা ভয়ানক চিৎকার করিয়া বিছানায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পরীকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেওয়ার জন্য, গলা টিপিয়া তাহাকে একেবারে মারিবার জন্য, সে একটা অদম্য অস্থির প্রেরণা অনুভব কবিতেছিল।

কিন্তু সংসারে সব কাজ করা যায় না। কাকে সে কী বলিবে ? এটা তাহাব বোনের শয়নঘব, কিন্তু ঘরের মালিক বনমালী। বনমালীকে কিছুতে বলা যায়ই না, পরীকে কিছু বলিলেও বনমালী নিজে অপমানিত জ্ঞান করিবে। দারোয়ান দিয়া এই রাত্রেই যদি তাহাকে আর ভুবনকে বনমালী বাহির করিয়া দেয়, আটকাইবে কে ? ছেলের হাত ধরিয়া এই দুর্যোগে সে যাইবে কোথায় ?

চারু আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দরজা যেমন ভেজানো ছিল, তেমনই ভেজাইয়া দিল।

আকাশে এখনও বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, আকাশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চিড় খাওয়া বিদ্যুৎ। চারু ভাবিতে লাগিল, এ কী মহা বিস্ময়ের ব্যাপার যে পরী শেষ পর্যন্ত বনমালীকে জয় করিয়া ছাড়িল, সেদিনকার কচি মেয়ে পরী ! এমন মূল্য দিয়াই সে বনমালীকে কিনিয়া নিল যে তার ছেলের সমগ্র ভবিষ্যৎটা সোনায় মণ্ডিত হইয়া গেল। বনমালী এইবার সারা জীবন অনুতাপ করিবে আর পরীর ছেলের পিছনে টাকা ঢালিবে !

হয়তো ভুবনকে না দিয়া এ বাড়িটা সে পরীকেই দান করিবে। বলিবে, ভুবন আর বাড়ি দিয়ে করবে কি চারুদি ? পরীকেই দিয়ে দিলাম।

ঘরে গিয়া খাটে বসিয়া ছেলের গায়ে হাত রাখিয়া চারু অনেকক্ষণ চুপচাপ ভাবিল।

সে জানে উহারা তাহার যাওয়াআসা টের পাইয়াছে। পাক টের। কাল তারা যদি তাহার কাছে লজ্জা বোধ না করে, তাহারও লজ্জা পাইবার কোনো কারণ থাকিবে না। পরী তাহার কে ? কেউ নয়। ছুঁইতেও ঘৃণায় গা শিহরিয়া উঠিল বলিয়া সে যাহার চোখ দুটা উপড়াইয়া আনিল না, সে তাহার বোন হইবে কোন দুঃখে ? কপাল পুড়িয়া যাওয়ার তিন মাসের মধ্যে এমন কাজ যে করিতে পারে বাড়ির ঝি-এর চেয়েও সে পর, অনাত্মীয়া। ওর অক্ষয় নরকের সঙ্গে তাহার কোনো সম্পর্ক নাই।

মনে মনে মস্ত এক প্রতিজ্ঞা করিয়া আঠারো বছরের ঘুমন্ত ছেলের মাথায় সস্নেহে চুমা খাইয়া চারু মেঝেতে তাহার সংক্ষিপ্ত কম্বলের শয্যায় নামিয়া গেল।

এ বাড়িতে পাপের বন্যা বহিয়া যাক, এ ঘরখানাকে সে পবিত্র মনে করিবে।—যতদিন বাঁচে সপুত্র এই ঘরের বায়ু সে নিশ্বাসে গ্রহণ করিবে। বাহিরে এমন বৃষ্টি হইয়া গেল, তাহাদের গায়ে লাগিল কি ? বাহিরে যত অন্যায়ই ঘটিয়া চলুক তাহাদের গায়ে ছোঁয়াচ লাগিবে না।

এই কথাটা বারবার ভাবিয়া এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করিয়াও চারু কিন্তু সমস্ত রাত ঘুমাইতে পারিল না। পরীর আদিম শৈশবের ইতিহাস ছায়াছবির রূপ নিয়া তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। বাপের বাড়ির গ্রামে পরী যখন ছেঁড়া ডুরে পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, আর বিবাহের পর এখানে আসিয়া পিঠে বেণি দুলাইয়া স্কুলে যাইত, তখনকার কথা। কত আদরে কত যত্নে তাকে সে মানুষ করিয়াছিল। সেই পরী যে আজ তাহার ভুবনের মুখের গ্রাস কাড়িয়া নেওয়ার জন্য এমন ভাবে নিজের সর্বনাশ করিল এর আকস্মিকতা এর অসামঞ্জস্য সমস্ত রাত চারুকে অভিভূত করিয়া রাখিল।

বনমালীকে ভালোবাসিয়া, যৌবনের অপরিতৃপ্ত অসং[illegible] ক্ষুধায় অথবা নেহাত ছেলেমানুষি খেয়ালে যে পরী এই নিদারুণ ভুল করিয়া থাকিতে পারে, চারুর মনে ঘুণাক্ষরেও সে কথা উদিত হইল না। যাহার বিবাহ হইয়াছে, যে তিনবছর স্বামীর ঘর করিয়াছে, বিশেষ করিয়া যে তাহার বোন, তাহার মধ্যে ও সব পাগলামি চারু কল্পনা করিতে পারে না। চল্লিশ বছরের জীবনে কাহারও মধ্যেই আভিজাত্যের চিহ্ন তো সে খুঁজিয়া পায় নাই।

মতলব থাকে। যে দিকে যে ভাবে মানুষ পা ফেলুক, পিছনে মতলব থাকে।

বনমালীর আটত্রিশ বৎসর বয়স হইয়াছে। টাকা ছাড়া তার আর কী আছে যে তার টানে মেয়েমানুষ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে ? মানুষটা একটু অদ্ভুত, একটু গভীর। প্রথম বয়সে মনে মনে সেও তাহাকে একটু ভয় করিত। মনে হইত তাহার ভিতরটা কী কারণে মুচড়াইয়া মুচড়াইয়া পাক খাইতেছে, তার বড়ো যন্ত্রণা। তখন বনমালী যুবক। তার মধ্যে সে তো তখনও কোনো আকর্ষণ আবিষ্কার করিতে পারে নাই ! তার নৈকট্যকে, তার নির্বাক আবেদনকে, তার দুচোখের গভীর তৃষ্ণাকে, সে যে কতবার অপমান করিয়াছে তার হিসাব হয় না।

তার সঙ্গে কথা কহিবার সময়ও কি সব সময় সে পাইত !

তাহার কাছে মানুষ হইয়া পরী কি তাহার মনের জোর এতটুকু পায় নাই ? অসহায় আক্রোশে থাকিয়া থাকিয়া চারুর মনে হইতে লাগিল, এর চেয়ে সেই যদি সে সময় বনমালীর নিকট আত্মসমর্পণ করিত তাও ভালো ছিল, এ রকম বিপদ ঘটাইবার সুযোগ পরী আজ তাহা হইলে পাইত না।

চারুর জীবনে অন্ধ আবেগের স্থান ছিল না। সমস্ত জীবন তাহাকে সংসারের এলোমেলো বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। প্রথম জীবনে তাহার লড়াই ছিল অভাবের সঙ্গে আর গ্রামের দু-তিনটি যুবকের স্বভাবের সঙ্গে। বিবাহের পর তাহার লড়াই শুরু হইয়াছিল ধনসম্পদের পলাতক প্রবৃত্তির সঙ্গে আর নিজেকে সামলাইয়া না চলার দুরন্ত ইচ্ছার সঙ্গে। এর কোনোটাই সহজ ছিল না। পুরুষ অভিভাবকের অভাবে সম্পত্তির ব্যবস্থা করিতে তাহার যেমন প্রাণান্ত হইত, অবাধ স্বাধীনতার সঙ্গে পাগলা স্বামীকে খাপ খা[illegible]যাইতেও তাহার তেমনই অবিরাম নিজেকে শাসন করিয়া চলিতে হইত। হাতে টাকা, দেহে রূপ, মনে অতৃপ্ত যৌবন—এ রকম ভয়ানক সমন্বয় ঘটিয়াছিল বলিয়া সারাজীবন তাহাকে অনেক ভুগিতে হইয়াছে।

চারুর হৃদয়ের কতকগুলি স্থান তাই ভয়ানক শক্ত।

পরদিন সকালে সে নিজে গিয়া পরীকে ডাকিয়া তুলিল, কিছুই যেন ঘটে নাই এমনিভাবে বলিল নে, ওঠ এবার। অনেক বেলা হয়েছে।

পরী সাড়া দিল না। পায়ের বুড়া আঙুলের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

খোকাকে তুলিয়া নিয়া বাহিরে আসিয়া চারু হাঁফ ছাড়িল।

কিন্তু তখনও আর একজন বাকি।

বনমালীকে চারু আবিষ্কার করিল বাগানে।

এক মুহূর্তের জন্য তার হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠিল। এই বাগানে এক স্বপ্নধূসর সন্ধ্যায় বনমালী এক রকম জোর করিয়াই একদিন তাকে প্রায় চুম্বন করিয়া বসিয়াছিল। সেদিন যদি সে বাধা না দিত !

গাছের ডাল হইতে টপটপ জল পড়িতেছিল। কতকগুলি ফুলের গাছ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

চারু বলিল, কী বৃষ্টিটাই কাল হয়ে গেল !

বনমালী বলিল, বেশ ঠান্ডা পড়েছে।

হ্যাঁ। কদিন গরমে প্রাণটা গেছে—আমি আজ একবার তাবকেশ্বর যাব ভাই।

বনমালী আচমকা বলিল, ক্ষেন্তির মা দুশো টাকা চেয়েছে, মেয়েকে নিয়ে কাশী যেতে চায়, তুমি যাবে ওদের সঙ্গে ?

চারু মাথা নাড়িল।

কাশী মাথায় থাক, তোমাদের ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না ভাই। ক্ষেন্তির মার কী ? হুট বলতে ও যেখানে খুশি যেতে পারে, আমরা পারিনে। আমাদের মায়ামমতা আছে। বিশ বছর ধরে যার সঙ্গে—

চারু একটা নিশ্বাস ফেলিল।

তারকেশ্বর রওনা হওয়ার আগে চারু বলিয়া গেল, ভুবন রইল ভাই, একটু দেখো। আর শোনো, কাল পরীর একাদশী, এই বয়সে ওর একাদশী করাব কী দরকাব কে জানে ! কথা কি শুনবে মেয়ে ! তোমাকে মানে, ফলটল যদি খাওয়াতে পার একটু চেষ্টা দেখো ভাই।

আগে, চারুর সরকার প্রথমে গিয়া একটা আস্ত বাড়ি ভাড়া করিয়া আসিত তবে চারু তারকেশ্বর যাইত। এবার সে সোজাসুজি যাত্রীনিবাসে গিয়া উঠিল।

প্রত্যেক দিন এই মানত করিয়া সে দেবতার কাছে পূজা দিল যে তার ফিরিয়া যাওয়ার আগেই পরী যেন কলেরা হইয়া মরিয়া যায়। পরীর যে আর বাঁচিয়া থাকার দরকার নাই দেবতাকে এই কথাটা সে খুব ভালো করিয়াই বুঝাইয়া দিল।

পরীর ছেলে ? পরীর ছেলেকে সে মানুষ করিবে।

তৃতীয় দিন মন্দিরে পূজা দিয়া যাত্রীনিবাসে ফিরিয়া চারু দেখিল, একটি বউয়ের কলেরা হইয়াছে। তাকে বিদায় করিবার ষড়যন্ত্র আর পলায়নপর যাত্রীদের কোলাহলে যাত্রীশালা সরগরম।

সকালে বউটির সঙ্গে চারুর পরিচয় হইয়াছিল। স্বামীর অম্বলের অসুখের জন্য ছেলেমানুষ দেওরকে সঙ্গে নিয়াই মরিয়া হইয়া সে ধর্না দিতে আসিয়াছে। বউটির নাম কনক, বয়স অল্প ; থুপথুপ করিয়া পা ফেলিয়া ওর চলার ভঙ্গি অনেকটা পরীর মতো !

দেওর শিশুকে দুধ খাইতে দিবে বলিয়া সকালে চারুর কাছে একটি পাথরের বাটি ধার করিতে আসিয়াছিল। ঘনিষ্ঠতা হইতে মিনিট দশেক লাগিল বইকী !

হ্যাঁ মাসিমা, কদিন থাকবেন আপনি ?

চারু হিসাব করিয়া বলিল, আজ নিয়ে হল তিনদিন, আরও পাঁচ-ছ দিন থাকবার ইচ্ছে আছে, এখন বাবা যা করেন। পরের কাছে পাগল ছেলে ফেলে এসেছি মা, থাকতে কি মন চায় ! কিন্তু দেখি কটা দিন, ছেলেটাকে কেমন যত্নআত্তি করে। আমি চোখ বুজলে ওদের কাছেই তো থাকতে হবে। বোসো বাছা এইখেনে, পা গুটিয়েই বোসো না, বিছানা একটু নোংরা হয়তো হবে। তুমি বুঝি ভাবছ

ছেলেকে ওরা কী ভাবে রাখছে ফিরে গিয়ে আমি তা কী করে জানব ? এতকাল একটা জমিদারি চালিয়ে এলাম, আমার কি ও সব ভুল হয় বাছা ? সে ব্যবস্থা করেই এসেছি, আমাদের পদ্ম ঝিকে দুটো টাকা দিয়ে এসেছি, চোখ দিয়ে সব দেখবে, কান দিয়ে সব শুনবে, ফিরে গেলে আমায় সব বলবে।

এখানে আসিয়া চারু কথা বলিয়া বাঁচিয়াছে। বাড়িতে থাকিলে ভাষার একটু সংযম দরকার হয়, কে জানে কে গ্রাম্য মনে করিবে, বুড়ি মনে করিবে !

কিন্তু যে যার হৃদয়-চর্চা নিয়া থাকে।

কনক বলিয়াছিল, আপনি তাহলে আছেন কদিন ? আমার দেওরকে একটু দেখবেন মাসিমা। বাবার দয়া হতে, দুদিন লাগে কি তিনদিন লাগে ঠিক তো কিছু নেই, একা কি করে থাকবে এখানে ভেবে বড়ো ভাবনা হচ্ছিল। আপনি যখন রইলেন তখন অবিশ্যি আর—

কনক একটু হাসিয়াছিল, শিশুকে ডাকিয়া বলিয়াছিল, মাসিমাকে প্রণাম কর শিশু।

কাল কনক ধর্না দিবে স্থির হইযাছিল, এখন আজ তাদের এই বিপদ।

ছেলেমানুষ শিশু একেবারে দিশেহারা হইয়া গিয়াছে, যে যা বলিতেছে তাই করিতে গিয়া কিছুই সে করিতে পারিতেছে না।

এদিকে যাত্রীনিবাসের কর্তা একটা গাড়ি ডাকাইয়া আনিয়া ক্রমাগত বলিতেছে, যাও না হে ছোকরা, হাসপাতালে নিয়ে যাও না, সবাইকে মারবে নাকি ? আচ্ছা বেযাক্কেলে লোক বাপু তুমি, কথাটা জানাজানি হবার আগে আমাকে একবার বলতে নেই ! দেখুন, আপনারা কেউ যাবেন না, কোনো ভয় নেই—আমি বলছি কোনো ভয় নেই। রুগি হাসপাতালে পাঠিয়ে এখুনি প্রত্যেক ঘরের চৌকাঠ থেকে চাল পর্যন্ত ডিসেনফিট করে দিচ্ছি।...আপনাদেব যদি কিছু হয় তো আমায় বলবেন তখন !

হলে আর তোমায় বলে কী হবে বাপু ? এই ধরনের প্রশ্ন করিলে যাত্রীনিবাসের কর্তা চোখ লাল করিযা একবার তার দিকে তাকাইতেছে, কিন্তু কোনো জবাব দিবাব লক্ষণ দেখাইতেছে না।

চারু সঙ্গের চাকরকে গাড়ি আনিতে পাঠাইয়া দিল।

শিশু এতক্ষণ তাহাকে দেখিতে পায় নাই, এবার তাহাব দিকে চোখ পড়ায় সে যেন অকূলে কূল পাইল।

মাসিমা, দেখুন না এবা জোর কবে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আপনি একটু বলে দিন না ?

চারু বলিল, তা যাও না বাছা, হাসপাতালেই নিয়ে যাও। এখানে কি চিকিৎসে হয় ? তাবপর ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, এখনও একজন ডাক্তার ডাকোনি, করেছ কী ? ডাক্তার আনতে পাঠাও বাছা, আগে ডাক্তার আনতে পাঠাও। তারপব অন্য কথা। বলিয়া নিজেব ঘরে ঢুকিয়া দবজা বন্ধ করিয়া দিল।

বাহির হইল গাড়ি নিয়া চাকর ফিবিয়া আসিলে।

শিশুকে ইশারায় কাছে ডাকিয়া বলিল, আমার পাথরেব বাটিটা ?

বাটিটা বউদি নোংবা করে ফেলেছে, মাসিমা।

চারু বিরক্ত হইয়া বলিল, কেন নোংরা কবেছে ? পরের জিনিস নিলে সাবধানে রাখতে হয় বাবু। আচ্ছা, যা করেছে বেশ করেছে, এবার বাটিটা এনে দাও.

একটু দাঁড়ান, ধুয়ে দিচ্ছি।

চারু অনাবশ্যক রূঢ়তার সঙ্গে বলিল, দাঁড়াবার আমার সময় নেই বাছা, তোমার বাটি ধোবার জন্য গাড়ি ফেল করব নাকি ? যেমন আছে তেমনই এনে দাও।

শিশু আর কথা না কহিয়া বাটি আনিয়া দিল। চারু তার একখানা পরনের কাপড় মাটিতে বিছাইয়া বলিল, এইতে দাও। অনেক পবত কাপড়ে বাটিটা সন্তর্পণে জড়াইয়া পুঁটলি করিয়া চারু

সেটা আলগোছে তুলিয়া নিল। নিজের জিনিস ফিরাইয়া নিয়া চোরের মতো কয়েকবার চারিদিকে চাহিয়া শিশুর হাতে দশ টাকার একটা নোট গুঁজিয়া দিয়া সে পলাইয়া আসিল।

বাড়ি ফিরিয়া ধুলাপায়ে সকলের আগে চারু পরীর হাতে পাথরের বাটিতে নির্মাল্য তুলিয়া দিল।

বলিল, এক হাতে নয়, দুহাতে ধর। ছেলের মা তুই তোর তো সাহস কম নয় পরী ! কপালে ঠেকিয়ে খেয়ে ফেল।

দুটো ভাত যে দিদি।

ভাত নয় প্রসাদ, খা।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে পরীর নির্মাল্য পান চাহিয়া দেখিল। তারপর বাটিটা নিয়া স্নানের ঘরে সাবান দিয়া সোডা দিয়া অনেকবার মাজিল। নিজে একঘণ্টা ধরিয়া স্নান করিয়া আসিয়া বেতের বাস্কেট হইতে দেবতার ফুল বাহির করিয়া ভুবনের কপালে ছোঁয়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোকে সকলে ভালোবেসেছে ভুবন ?

ভুবন অস্বীকার করিল।

তোমার কাছে পালিয়ে যাচ্ছিলাম, কেষ্ট আমায় ধরে আনল কেন ? আমায় ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল।

চারু ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল, কীরে পদ্ম ? সকলের ভাবসাব কী রকম দেখলি বল তো !

পদ্ম জানাইল সকলের ভাবসাব মন্দ নয়। আবার ভালোও নয় কিন্তু। দুয়ের মাঝামাঝি। পরী তার ভাগনেকে ঠিক সময় মতো না হোক ডাকিয়া খাওয়াইয়াছে, মার জন্য হাউহাউ করিয়া কাঁদিলে ভোলানোর চেষ্টাও যে করে নাই এমন নয়। তবে চোখে চোখে ওকে কেউ রাখে নাই। কাল দুপুরবেলা ভুবন চুপিচুপি পলাইতেছিল, পদ্ম দেখিতে পাইয়া কেষ্টকে দিয়া ধরাইয়া আনিয়াছে। গোলমাল শুনিয়া আসিয়া বনমালী তাকে কয়েক ঘণ্টা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

কী জান মা, মার মতো কেউ কি করে ?

চারু বলিল, আমি যে চিরকাল বাঁচব না পদ্ম, তখন কী হবে ? মারধর করেনি তো কেউ ?

ধরিয়া আনিবার সময় কাল কেষ্ট বুঝি ভুবনকে একটু মারিয়াছিল, কিন্তু পদ্ম সে কথা গোপন করিয়া গেল।

না মারধর কেউ করেনি।

চারুর পুরা নাম চারুদর্শনা, পরীর পুরা নাম পরীরাণী। এগুলি কেবল যে নাম তা নয়। মানানসই নাম।

সারাদিন পরীকে চারু আজ বিশেষভাবে সুন্দরী দেখিল,---অপরূপ, অভিনব। পরী যতবার তার লাল-করা ঠোঁট দুইটি ফাঁক করিয়া হাসিল, ততবারই চারুর সর্বাঙ্গে একটা শিহরন বহিয়া গেল।

ভাবিল, না, এত রূপ নিয়ে সংসারে থাকাটা কিছু নয়। চাদ্দিকে আগুন জ্বেলে দিত বই তো নয়।

শরীরটা চারুর ভালো লাগিতেছিল না। সে সকাল সকাল শুইয়া পড়িল। একটা আশঙ্কা সে মন হইতে কোনো মতেই দূর করিতে পারিতেছিল না যে, আজ রাত্রেই যদি পরীর কলেরার লক্ষণ প্রকাশ পায় ভুবনকে কোথাও সরানোর সময় পাওয়া যাইবে না। তারকেশ্বরের সেই বউটির ভেদবমির কথা স্মরণ করিয়া চারুর গা ঘিনঘিন করিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল একটা নোংরামির মধ্যে সে শুইয়া আছে, বিছানাটা অপবিত্র, অশুচি।

সম্ভবত মনের ঘেন্নাতেই খানিক পরে চারুর বমি আসিতে লাগিল।

আর খানিক পরে সে প্রথমবার বমি করিল। একবার বমি করিয়াই তার মনে হইল সমস্ত শরীরের রস তার শুকাইয়া গিয়াছে।

বমির শব্দে পরী উঠিয়া আসিয়াছিল, চারু কাঁদিয়া তাকে বলিল, ও পরী, আমার কলেরা হয়েছে, বনমালীকে ডাক শিগগির।

বনমালী উঠিয়া আসিল। ডাক্তারকে ফোন করা হইল।

ডাক্তার আসিল একঘণ্টা পরে। ইতিমধ্যে চারুর মাথা একেবারে খারাপ হইয়া গিয়াছে। বিড়বিড় করিয়া আপন মনে কী যে সে বকিতে লাগিল কেহ তার মানে বুঝিল না। মানে বুঝুক আর না বুঝুক বনমালী বারকতক তাকে শুনাইয়া দিল যে ভুবনের জন্য তার কোনো ভয় নাই, ভুবনের ভার সে নিল।

পরীর মনে হইল তারও কিছু বলা দরকার।

ভুবনকে আমি চোখে চোখে রাখব দিদি, চোখের আড়াল করব না কখনও।

কিন্তু মরিয়া গেলেও চারু কি ইহার একটি কথা বিশ্বাস করে! চল্লিশটা বছর সংসারে বাস করিয়া শিক্ষা পাইয়াছে শুধু মৃত্যু কেন, মৃত্যু যাহার বিধান তারও বোধ হয় ক্ষমতা নাই সে শিক্ষা তাহাকে ভুলাইয়া দেয়।

কদিন পরী খুব কাঁদিল। দিদি আমায় বড়ো ভালোবাসত, এই কথা বনমালীকে সে কতবার যে শোনাইল তার ইয়ত্তা নাই। বনমালী সভয়ে তাহাকে এড়াইয়া চলিতে লাগিল।

তখন পরী সভয়ে কান্নাও বন্ধ করিল এবং সুরও বদলাইয়া ফেলিল।

একদিনের তরে সুখ কাকে বলে জানেনি। তারপর ওই তো ছেলে। গিয়েছে না বেঁচেছে। বনমালী বলিল, শরীরও ভেঙে গিয়েছিল।

পরী বলিল, হ্যাঁ। অম্বলের অসুখটা হবার পর থেকে একরকম মরবার দাখিল হয়েছিল।

অথচ একটু যত্ন হয়নি।

না। নিলে তো কারও যত্ন ! তেমন মানুষই ছিল না দিদি। সকলের সেবাই করেছে প্রাণপণে, পরের জন্য খেটে খেটে প্রাণটা দিয়েছে।

আড়চোখে চাহিয়া আবার বলিল, বড়ো ঘা খেয়ে গেল। আমাদের একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল, কী বল ?

হলে না কেন ?

পরী হাসিয়া বলিল, বাঃ, বেশ ; আমি হলাম মেয়েমানুষ, আমাদের কি অত হিসাব থাকে ? তুমি ঘরে এলে আমার বলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুল হয়ে যায়, সাবধান থাকব !

বনমালী বলিল, তাই নাকি !

চারুর মৃত্যুর পর বনমালী দিনে অথবা রাত্রে কখনও পরীর ঘরে আসে নাই। দুর্ভাবনার পরীর আর সীমা ছিল না। চুলে সেদিন সে অল্প একটু তেল দিল, এলোচুলে একটু স্নিগ্ধ রুক্ষতাই ভালো মানায়। আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ভাবিবার পর বাটিতে পাতলা করিয়া আলতা গুলিয়া গালে লাগাইয়া সিল্কের রুমাল দিয়া মুছিয়া নিল। ছোটো একটি পান সাজিয়া মুখে নিয়া একটু চিবাইয়া ফেলিয়া দিল।

তারপর বনমালীর বেড়াইতে যাওয়ার সময় সামনে পড়িয়া একটু হাসিল।

শোনো। কাছে সরে এসো, কানে কানে বলি। একটা ফিডিংবোতল এনো, আমি মরুভূমি হয়ে গেছি। আনবে তো ?

আনব। পদ্মর কাছে খোকা ভারী কাঁদছে পরী।

পদ্ম ওকে ইচ্ছে করে কাঁদায়।

পদ্মর কাছে না দিলেই হয়।

আমাকে সেজেগুজে ফিটফাট থাকতে না বললেই হয় !

বনমালী তাহার গালে একটা টোকা দিল।

না সাজলেই তোকে ভালো দেখায় পরী।

বনমালী চলিয়া গেলে পরী ছুটিয়া গিয়া পদ্ম-ঝির কাছ হইতে খোকাকে ছিনাইয়া নিল। চোখ পাকাইয়া বলিল, তোকে না পাঁচশোবার বলেছি বাবুর ধারেকাছেও খোকাকে নিয়ে যাবি না ?

পদ্ম একগাল হাসিয়া বলিল, বাবু নিজে ডাকলে গো। বললে, খোকাকে আন তো পদ্ম। ভয়ে মরি দিদিমণি।

মরণ তোমার ! ভয় আবার কীসের ?

তা যাই বল, বাবুকে আমি বড্ড ডরাই বাপু ! দেখলে বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করতে থাকে দিদিমণি। এই অ্যাদ্দুর থেকে বাবুকে আমি গড় করি।

পরী হাসিয়া বলল, আচ্ছা আচ্ছা, বেশ করিস। তারপর কী হল বল।

ভয়ে ভয়ে খোকাকে তো নিয়ে গেলাম। বাবু কোলে নিলে, আদর করলে, চুমো পর্যন্ত খেলে। তারপর বললে, বেশ ছেলেটা, নারে পদ্ম ? লজ্জায় মরি দিদিমণি।

বনমালী বেড়াইয়া ফিরিলে পরী বলিল, আচ্ছা, পরের ছেলেকে তুমি এত ভালোবাসলে কী করে বলো তো ? তোমার হিংসা হয় না ?

বনমালী হাসিয়া বলিল, না দুদিনের জন্য এসেছে, ওকে আবার হিংসে করব কী ? বরং তোর ছেলে বলে ভালোই বাসি।

পরীর মুখ শুকাইয়া গেল।

এ কী পরিণাম ! সংক্ষিপ্ত ও সাংঘাতিক !

আরশি কি প্রত্যহ মিথ্যা বলিয়াছে ? বনমালীর সেই উগ্র আবেগময় ভালোবাসা এর মধ্যে উপিয়া গেল কী করিয়া ? আজন্ম দেখিয়া আসিয়াও আরশিতে নিজেকে তাহাব প্রত্যহ নতুন মনে হয়, আপনার রূপ ও যৌবনের এক একটা অভিনব ভঙ্গিমা আজও সে প্রত্যহ আবিষ্কার করে। আর বনমালীর কাছেই এব মধ্যে পুরানো হইয়া গেল ? মাথায় না তুলিয়া বনমালী তাহাকে কোথায় নামাইয়া দিতে চায় ?

পরীর বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। তাহার পাপের সমান অংশীদার তখনও চোখের আড়ালে চলিয়া যায় নাই। তাকাইয়া দেখিয়া পরীর মনে হইল পদ্ম-ঝি বড়ো মিথ্যা বলে নাই। বনমালীকে সেও কম ভয় করে না।

অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া বনমালীর চিরদিনের স্বভাব। জীবনের কোনো স্তরই একটা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ছাড়া তাহাকে নিজস্ব কবিয়া রাখিতে পারে নাই। জীবনের বৈচিত্র্যগুলি বনমালী দ্রুতগতিতে সমগ্রভাবে আয়ত্ত করিয়া নেয়। তাহার উপভোগ যেমন প্রখর তেমনই অধীর। স্থূল হোক সূক্ষ্ম হোক জীবনের রস-বস্তুকে সে তাড়াতাড়ি জীর্ণ করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়ে।

তাহাকে জব্দ করিয়াছিল চারু।

চারু তার প্রথম বয়সের নেশা ; অদম্য, অবুঝ, বহুকাল স্থায়ী। যে বয়সে নারীদেহের সুলভতা সম্বন্ধে প্রথম জ্ঞান জন্মে, নারীমনের দুর্লভতায় প্রথম হতাশা জাগে চারুকে বনমালী সেই বয়সে দেহ মন দিয়া চাহিয়াছিল। চারু রীতিমতো তাহাকে নিয়ে খেলা করিত ; ওষুধের ডোজে আশা দিয়া তার প্রেমকে বাঁচাইয়া রাখিত এবং প্রাণপণে এই খেলার উন্মাদনা উপভোগ করিত। বনমালীর এক গ্রাসে পেট ভরানোর প্রবৃত্তি ক্ষুধাতুর বন্য জন্তুর মতো চারুর দুর্ভেদ্য সাবধানতা ঘেরিয়া পাক খাইয়া মরিত দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

পরীর রূপ আছে, চারুর মতো প্রতিভা নাই। বনমালীর পাকখাওয়া মনকে সে একাভিমুখী করিয়া রাখিতে পারিল না। তাহার নদীতে হাঁটু ডুবাইয়া বনমালী পার হইয়া গেল, সে তাকে ভাসাইয়া নিতে পারিল না।

পরী তাহার ঘরে সযত্নে শয্যা রচনা করিয়া রাখে, বালিশের নীচে জুঁই আর বেল ফুল রাখিয়া দেয়। কিন্তু যাহার জন্য ফুলগুলি হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া চাপা গন্ধ বিলায় সে আসে না। সোজাসুজি নিমন্ত্রণ করিবার সাহস পরীব নাই, জানালায় বসিয়া সে শুধু কাঁদে। এখন প্রকৃত বর্ষাকাল। প্রতি রাত্রেই প্রায় বাদল নামে। গাঢ় ভিজা অন্ধকারে বিবরবাসিনী নাগকন্যার মতো পরী ফুলিয়া ফুলিয়া সাশ্রু নিশ্বাস নেয। খোকা কাঁদে, ককায়, তাহার গলা ভাঙিয়া আসে, শ্রান্ত হইয়া এক সময় ঘুমাইয়া পড়ে। পরী সাড়াশব্দ দেয় না। খানিক পরে খোকার মুখের উপর ঝুঁকিয়া মন্ত্রোচ্চারণের মতো বলিতে থাকে, শোধ নিস, শোধ নিস ; তাতেই হবে। ছাড়বি কেন ? শোধ নিস।

তারপর অদম্য আক্রোশে খোকার দুই কাঁধ ধরিয়া সজোরে ঝাঁকি দিয়া চেঁচাইয়া উঠে, কেন তুই এসেছিলি হারামজাদা !

গভীর রাত্রে দরজা খুলিয়া সে বাহিরে চলিয়া যায়, প্যাসেজেব আলো নিভাইয়া অন্ধকাবে এ বারান্দা ও বারান্দা ঘুরিয়া বেড়ায়, ঘবে ঘবে উঁকি দেয, বনমালীর ঘবের দরজায় কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

একদিন নৈশ পর্যটনের সময় ভুবনের ঘরে উঁকি দিয়া সে দেখিতে পাইল বিছানায উপুড় হইযা সে হাপুস নয়নে কাঁদিতেছে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দৃশ্যটা সে খানিকক্ষণ উপভোগ করিল। সে চিবদিনই দুঃখী, অন্যের দুঃখ দেখিলে সে আনন্দ পায়।

তারপর পা টিপিয়া টিপিযা গিয়া বনমালীকে সে ডাকিযা তুলিল।

ভুবন কী রকম করছে দেখবে চলো।

কী রকম করছে ?

কাঁদছে আর ছটফট করছে। অন্ধকাবে পরী বনমালীর গা ঘেঁষিযা আসিল।

বনমালী বলিল, প্যাসেজেব আলো নিভিয়েছে কে ?

আমি।

বনমালী সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিল। পরী সঙ্কুচিতা হইয়া বলিল, দ্যাখো তো কী করলে ! নিভিয়ে দাও।

বনমালী তাহার আলো নিভানোব প্রয়োজনটা চাহিয়া দেখিল না।

ঘরে যাও, বলিয়া ভুবনের ঘরের দিকে আগাইয়া গেল।

রোষে ক্ষোভে আত্মহারা পরী আলোকে লজ্জা দিয়া আলোর নীচে দাঁড়াইয়া রইল।

বনমালীর পাশের ঘরখানা হেমলতাব। তিনি দিনের বেলায় বিছানায শুইযা থাকেন বলিয়া রাত্রে বিছানায় শুইয়া আর ঘুমান না, ঝিমান। বাবান্দায় কথা শুনিযা তিনি বাহির হইযা আসিলেন।

কে রে ? পরী নাকি ? বনমালীব ঘবের সামনে দাঁড়িয়ে তুই কী কবছিস পবী ? বলিযা ঠাহর করিয়া যোগ দিলেন, মরণ তোমার, বেহায়া মেযে !

পরী তখন যে কাজ করিয়া বসিল তাহার অর্থ ও উদ্দেশ্য পরিষ্কার। চট করিযা বনমালীর ঘরে ঢুকিয়া সে দড়াম করিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল এবং স্তম্ভিতা হেমলতা নড়িবার শক্তি ফিরিয়া পাওয়ার আগেই বনমালীর একটা চাদর গায়ে জড়াইয়া তাহার পাশ কাটাইযা ছুটিযা নিজেব ঘবে চলিয়া গেল।

হেমলতা শূন্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এ কী কাণ্ড মা ! অ্যাঁ ?

পরদিনটা কোনোরকমে চুপ করিয়া থাকিয়া তার পরের দিন হেমলতা ছেলেকে অনুরোধ করিলেন, পরীকে এবার পাঠিয়ে দে বনমালী।

দেব। এখন থাক।

পরীকে এখন সে অবহেলা করিতেছে। অমন সুন্দর একটা পুতুলের আবোল-তাবোল নাচ দেখিতে তার ভারী মজা লাগিতেছে। এ অবস্থাটি অতিক্রান্ত না হইলে বনমালী তাহাকে কোথাও পাঠাইবে না।

হেমলতা অত জানেন না, তিনি আবার বলিলেন, না বাবা, পাঠিয়েই দে। স্বামী না থাক, স্বামীর ঘর তো আছে। কেন পরের বোঝা ঘাড়ে করে আছিস ?

বনমালী হাই তুলিয়া বলিল, দুটি খায়, ও আবার বোঝা কী মা ?

হেমলতা আর কিছু বলিতে সাহস পাইলেন না। ডাইনির মায়া হইতে ছেলেকে কেমন করিয়া উদ্ধার করিবেন শুইয়া শুইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কবিরাজের মাথা গরম না করিবার উপদেশটা পর্যন্ত তাঁহার স্মরণ রহিল না।

দুদিন পরে আবার বলিলেন, যে রাগি মানুষ তুই, তোকে বলতে সাহস হয় না বাবু। কিন্তু চোখ মেলে এ তো আর দেখা যায় না বনমালী !

কী হয়েছে ?

রাগের মাথায় কিছু করে বসবি না, বল ?

বনমালী হাসিয়া বলিল, না। আমার রাগ হবে না, বলো।

হেমলতা গলা নিচু করিয়া বলিলেন, পরীর স্বভাবচরিত্র ভালো নয় বনমালী। মেয়ে মিটমিটে ডান। শ্রীধরের ভাইটা আসে জানিস ? ওই যে রোগা লম্বা কোঁকড়া চুল ?

জানি। আমার চিঠি টাইপ করে।

আমি নিজের চোখে দেখেছি, বনমালী। দুপুর বেলা সেদিন চোরের মতো পরীর ঘর থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে নীচে নেমে গেল।

কবে ?

পরশু।

বনমালী হাসিয়া বলিল, পরশু তো ? আমি তখন পরীর ঘরে ছিলাম, টাইপ করার জন্য শ্রীধরের ভাই একটা দরকারি চিঠি নিতে এসেছিল। মানুষকে অত সন্দেহ কোরো না মা। পরী সে রকম নয়।

হেমলতার মাথা ঘুরিতে লাগিল। তার মিথ্যার পাশে ছেলের মিথ্যা আসিয়া দাঁড়ানো মাত্র মুখোশ গেল খুলিয়া, গোপন সত্য প্রকাশ হইয়া গেল, লজ্জার আর সীমা রহিল না। বনমালী চলিয়া গেলে তিনি ভাবিলেন, বাহাদুরি করিতে যাওয়ার এই শাস্তি। চুপচাপ থাকিলেই হইত ! আটত্রিশ বছরের লাখপতি ছেলের ভালো করিতে যাওয়া কী তাহার সাজে ?

এদিকে, বনমালীর স্বাভাবিক সংযত নির্মতায় পরী পাগল হইয়া উঠিল। কেন এ রকম হইল, বনমালীর অমন উদ্দাম কামনা তুবড়ির মতো জ্বলিয়া উঠিয়া এমন অকস্মাৎ কেমন করিয়া নিভিয়া গেল কিছুই সে বোঝে না, দিনরাত আগের অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার উপায় চিন্তা করে। ভাবে, অভিমান করে গম্ভীর হয়ে থাকব ? যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে হেসে খেলে দিন কাটাব ? আর কারও দিকে একটু ঝুঁকব ? একদিন রাতদুপুরে ঘরে গিয়ে পাগলের মতো বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ব ? পায়ে ধরে যে দোষই করে থাকি তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেব ?

এর মধ্যে শেষ কল্পনাদুটিকে সে কার্যে পরিণত করে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। দিন দিন পরী শুকাইয়া যায়।

ভুবনকে এখন বনমালী খুব ভালোবাসে।

অন্তত তার ভাব দেখিয়া তাহাই মনে হয়।

কেষ্টকে সে অন্য কোনো কাজ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছে, ভুবনকে সর্বদা চোখে চোখে রাখিবে। খাওয়ার সময় বনমালী ভুবনকে কাছে খাইতে বসায়, প্রায়ই তাহাকে সঙ্গে নিয়া মোটর

চাপিয়া বেড়াইতে যায়, অবসর সময়ে কাছে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে কথা বলে, তাহাকে নানান বিষয় শিখাইবার চেষ্টা করে।

তার বুদ্ধির জড়তা বিনষ্ট করিবে এই তাহার ইচ্ছা। কাজের মতো একটা কাজ পাইয়া বনমালী ভারী সুখী।

বলে, ওকে চারুদি বোকা করে রেখেছিল, আসলে ও বোকা নয়।

পরী তোষামোদ করিয়া বলে, আগে থাকতে তোমার হাতে পড়লে অ্যাদ্দিন ও মানুষ হয়ে যেত। খোকাকেও তুমিই মানুষ করে দিয়ো।

তারপর হাসিয়া যোগ দেয়, যেন মানুষ করবে না, তাই বলে দিচ্ছি।

বনমালীর প্রতি ভুবনের আনুগত্য অদ্ভুত !

হেমলতার জ্বর হইয়াছে। তিনি আর বাঁচিবার আশা করেন না। তাই প্রাণপণে ছেলের সেবা আদায় করিয়া নিতেছেন।

বনমালী বলে, আপিসে কাজ আছে মা, যেতে হবে।

হেমলতা বলেন, আমায় চিতায় তুলে দিয়ে যাস।

শিয়রে বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া বনমালী বিকালে বাগানে পায়চারি করিতে যায়। এদিকে ভুবন বারবার হলঘরের বড়ো ঘড়িটার দিকে তাকাইতে থাকে। একবার সে ভয়ানক চমকাইয়া ওঠে। এইমাত্র সে দেখিয়া গেল, পাঁচটা বাজিয়া কুড়ি মিনিট হইয়াছে, এর মধ্যে সাড়ে দুটা বাজিতে চলিল কী করিয়া ?

ঘড়ির ডায়ালটা ভালো করিয়া দেখিবার চেষ্টায় ভুবনের প্রকাণ্ড দেহটা বিহ্বল প্রশ্নের ভঙ্গিতে পিছন দিকে হেলিয়া যায়। তারপর এক সময় সে তাহার ভুল বুঝিতে পারে। ঘড়ির বড়ো কাঁটা আর ছোটো কাঁটার মধ্যে গোলমাল করিয়া ফেলিয়া সে যেন ভারী কৌতুক করিয়াছে এমনিভাবে সে হাসিয়া ফেলে। মুষ্টি তুলিয়া ঘড়িটাকে শাসন করিয়া বলে, ভেঙে ফেলে দেব, পাজি কোথাকার !

ঘড়িতে ছটা বাজিতে আরম্ভ করামাত্র সে বাগানে ছুটিয়া যায়। বলে, ছটা বাজল মামা।

তাহার কথা শেষ হওয়ার আগে অথবা পরে হলঘরের ঘড়িটা নীরব হয় ঠিক বোঝা যায় না।

বনমালীর এক প্রকার অভূতপূর্ব অনুভূতি হয়। ছটার সময় হেমলতাকে ওষুধ খাওয়াইতে হইবে, কিন্তু সময়মতো ডাকিয়া দিবার কথা ওকে সে কিছুই বলে নাই। যাহাকে বলিয়াছিল সে হয়তো কার সঙ্গে গল্পে মাতিয়াছে, কিন্তু অন্যকে দেওয়া তাহার সে আদেশ ভুবন ভোলে নাই। কাঁটায় কাঁটায় অক্ষরে অক্ষরে আদেশ পালন করিয়াছে।

কেন করিয়াছে ? তাহাকে একটু খুশি করার জন্য। কোনো প্রত্যাশা করিয়া নয়, কোনো মতলব হাসিল করিবার জন্য নয়, তাহাকে খুশি করিবার প্রেরণা মনের মধ্যে ছিল, শুধু এই জন্য !

ভুবনকে সে যে ভালো বাসিয়াছে সেটা তাই অকারণ নয়। ভুবনের নিষ্কাম প্রেম ছাড়া আরও একটা গৌণ কারণও ইহার ছিল। চারুর জন্য পরী কাঁদিয়াছে, কিন্তু তাহার কান্নায় বনমালী হইয়াছে বিরক্ত ; চারুর জন্য ভুবনের শোক একটিবার মাত্র দেখিয়া বনমালীর মনে শোকের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। আহত পশুর মতো ভুবন মধ্যে মধ্যে মার জন্য ছটফট করিয়া কাঁদে ; বনমালীর শুষ্ক তৃণহীন জগতে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যায়।

পরীর সামনেই একদিন সে ভুবনকে বলিল, একটা বাড়ি নিবি, ভুবন ?

নেব মামা !

আচ্ছা, তোকে একটা বাড়ি লিখে দেব।

এ বাড়ি অবশ্য নয়, শ্যামবাজারের একটা ছোটো বাড়ি সম্প্রতি এক প্রকার বিনামূল্যেই বনমালীর হাতে আসিয়াছে। সেই বাড়িটি দান করিবার কথাই সে ভাবিতেছিল। কিন্তু পরী তো তাহার

মনের খবর রাখে না, সে ভাবিল ভুবনকে বনমালী এই বাড়িটিই দিয়া দিবে, একদিন মিথ্যা করিয়া চারুকে সে যাহা বলিয়াছিল তাহা পালন করিবে।

পরীর বুকের মধ্যে জ্বালা করিতে লাগল। খোকাকে অনেকক্ষণ বুকে চাপিয়া রাখিয়াও সে জ্বালা তাহার কমিল না।

সারাদিন তাহার মেজাজ রুক্ষ হইয়া রহিল। বনমালীর আশ্রিতাদের মধ্যে সকলের চেয়ে নিরীহ ক্ষেন্তির মাকে এমন অপমানই সে করিল যে গৃহপালিতা কুক্কুরীব মতো অপমান-জ্ঞানহীনা সেই নারীটি কাঁদিয়া ফেলিল।

তারপর পদ্ম-ঝির সঙ্গে পরীর কলহ হইয়া গেল। বিকালে বিনা অপরাধে কেষ্টকে সে তাহার পায়ের ঘাসের চটি ছুঁড়িয়া মারিল।

এবং পঞ্চমী তিথিতে একাদশী করিয়া গভীর রাত্রে উন্মত্তার মতো বনমালীর রুদ্ধ দরজার সামনে মাথা-কপাল কুটিয়া আসিয়া ঘুমন্ত ছেলেটাকে হ্যাঁচকা টানে কোলে তুলিয়া নিয়া কয়েক সেকেন্ডের জন্য তাহার কচি গলাটি সজোরে টিপিয়া ধরিল।

গলা ছাড়িয়া দিবার পর কাশিতে কাশিতে খোকা বমি করিয়া ফেলিল। পরদিন দেখা গেল গলা তাহার লাল হইয়া আছে এবং কাঁদিতে গিয়া সে শব্দ বাহির করিতে পারিতেছে না।

পদ্ম ভয় পাইয়া বলিল, কী করে এমন হল দিদিমণি ?

পরী ফিসফিস করিয়া বলিল, বাবুর কীর্তি পদ্ম। অন্ধকারে—

পদ্ম চোখ মিটমিট করিয়া বলিল, সেরে যাবে। আমি ভাবলাম পেলেগ। হুঁদো বেড়ালটার হয়েছিল দেখনি ? দেখে আমি তো ঘেন্নায় মরি দিদিমণি, গলা জুড়ে এই ঘা পুঁজে রক্তে—।

* * * *

কয়েকদিন পরে হেমলতার অসুখ হঠাৎ বাড়িয়া যাওয়ায় তাকে নিয়া বনমালী বিশেষ ব্যস্ত আছে, দুপুরবেলা পরী চুপিচুপি ভুবনকে বলিল, মার কাছে যাবি, ভুবন ?

ভুবন উৎসুক হইয়া বলিল, যাব।

এক কাজ কর তবে। জামা গায়ে চুপিচুপি খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গলিতে দাঁড়িয়ে থাকবি যা। আমি যাচ্ছি, গাড়ি চাপিয়ে তোকে মার কাছে নিয়ে যাব।

ভুবন তৎক্ষণাৎ জামা গায়ে দিল।

মামাকে বলে যাই ?

তবেই তুমি গিয়েছ ! মামা তোকে যেতে দেবে ভেবেছিস ? ছাই দেবে !

ভুবন আর কথা কহিল না। চটি পায়ে দিয়া মার কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া নিল।

পরী বলিল, কাউকে কিছু বলিসনে কিন্তু খবরদার। বললে নিয়ে যাব না। যা, রাস্তায় দাঁড়াগে।

ভুবনের এক মিনিট পরে খোকাকে কোলে নিয়ে খিড়কির দরজা দিয়া বাড়ির পিছনদিকের গলিতে নামিয়া গিয়া পরী দেখিল, ভুবন তার প্রতীক্ষায় চঞ্চল হইয়া আছে। হাত ধরিয়া পরী তাহাকে হনহন করিয়া টানিয়া নিয়া চলিল। বড়ো রাস্তায় পড়িয়া ট্যাক্সি ধরিয়া হাজির করিল একেবারে হাওড়া স্টেশনে।

দরাজ হাতে অনেকগুলি নোট কাউন্টারের ওপাশে চালান করিয়া দিয়া বোম্বে পর্যন্ত ফার্স্টক্লাসের একখানা টিকিট কিনিয়া গাড়ি ছাড়ার অল্প আগে পরী ভুবনকে বোম্বে মেলের একটি খালি ফার্স্টক্লাস কামরায় তুলিয়া দিল।

যা যা বলেছি মনে আছে, ভুবন ? কাল বিকেলে ঠিক ছটার সময় যেখানে গাড়ি থামবে সেইখানে নেমে যাবি।

ভুবন বলিল, আমি ঘড়ি দেখতে জানি মাসি। পকেট হইতে দশ টাকা দামের ঘড়িটি বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল, মামা দিয়েছে। কটা বেজেছে জানো ? তিনটে বেজেছে।

ঘড়ি দেখে কাল ঠিক ছটার সময় নেমে যাবি। গাড়ি না থামলেও লাফিয়ে নেমে যাবি। মার কাছে যাচ্ছিস কিনা, দেখিস তোর কিছু হবে না।

ভুবন বলিল, আচ্ছা।

রেলের লোক টিকিট দেখতে চাইলে দেখাবি। খিদে পেলে খাবার কিনে খাবি। টাকা ঠিক রেখেছিস ? ওটা পাঁচ টাকার নোট জানিস তো ? ভাঙিয়ে কাল খাবার কিনিস।

মা স্টেশনে আসবে, মাসি ?

আসবে।

ভুবনের মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল।

খোকাকে দাও না মাসি, একটা চুমু খাই।

পরী খোকাকে বুকের মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিল।

না না, এখখুনি গাড়ি ছেড়ে দেবে।

গলির মুখে ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিয়া খিড়কির দরজা দিয়াই পরী বাড়ি ঢুকিল। তাকে অভ্যর্থনা করিল বনমালী স্বয়ং।

ভুবনকে কোথায় রেখে এলি পরী ?

ভুবন ? ভুবনের আমি কী জানি ! বাড়ি নেই ?

বনমালী হাঁকিল, কেষ্ট এদিকে আয়।

কেষ্ট ভয়ে ভয়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

তোকে ছাড়িয়ে দিলাম কেষ্ট। মাইনে যা জমেছে পাবি না। পালা, দাঁড়িয়ে থাকলে পুলিশে দেব।

কেষ্ট কাঁদোকাঁদো হইয়া বলিল, কেন বাবু ?

রাত দুপুরে তুই দোতলায় এসে দাঁড়িয়ে থাকিস বলে। আমার নশো টাকা চুরি গেছে।

ঝি-চাকর আশ্রিত ও আশ্রিতারা চারিদিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পরীর বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করিতেছিল।

অতি কষ্টে জিজ্ঞাসা করিল, ভুবন কোথায় গেছে কেষ্ট ? পালিয়ে গেছে ?

কেষ্টর হইয়া জবাব দিল বনমালী।

ও জানে না। তুই ঘরে যা পরী।

দোতলায় যে ঘরখানায় সে এতদিন ছিল বনমালী যে সে ঘরখানার কথা বলে নাই ঘরে ঢুকিয়াই পরী তাহা টের পাইল। তার সমস্ত জিনিস অদৃশ্য হইয়াছে। ধোয়ামোছা শূন্য ঘরের মাঝখানে সে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বনমালী আসিয়া বলিল, এখানে থাকতে তোর অসুবিধা হচ্ছিল বলে তোকে নীচের একটা ঘর দিয়েছি পরী। ক্ষেন্তির পাশের ঘরখানা।

নীচে ভাঁড়ারের পাশে একসারিতে খান সাতেক ঘর আছে, বনমালী যাদের খাইতে দেয় ওটা তাদের কলোনি অথবা বস্তি। ক্ষেন্তির পাশের ঘরখানা ওই সারিতেই।

পরীর মুখ পাংশু হইয়া গেল। ইতিমধ্যে শুধু সন্দেহের উপর তার বিচার হইয়া শাস্তির ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে, এটা সে হঠাৎ ধারণা করিয়া উঠিতে পারিল না। এ বাড়িতে যাদের স্থান ঝি-চাকরেরও

নীচে বনমালী অনায়াসে তাকে তাদের দলে নামাইয়া দিল ? সারাদিন ধরিয়া সে যে নিজের অনুপস্থিতির কৈফিয়ত রচনা করিয়াছে সেটা একবার শোনাও দরকার মনে করিল না ?

সে কাঁদিয়া ফেলার উপক্রম করিয়া বলিল, আমি কী করেছি ? তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।—

কিন্তু গা সে ছুঁইবে কার ? বনমালী আগাইয়া গিয়াছে, বিদায় নিয়াছে।

পরীকে নীচেই যাইতে হইল।

ক্ষেন্তি বলিল, কী গো, ওপর থেকে তাড়িয়ে দিলে ? বড়োলোকের মর্জি দিদি, কী করবে বলো।

পরী বলিল, কী যে বলো তার ঠিক নেই। তাড়িয়ে আবার দেবে কে ? আমি যেচে এসেছি। ওপরে যে সব ম্লেচ্ছাচার—বিধবা মানুষ আমি, আমার পোষালো না।

ক্ষেন্তি বলিল, ভাবলে অবাক লাগে বোন, এ বাড়ি তো একদিন তোমার নিজের দিদির ছিল ! আজ যে রানি, কাল সে দাসী। হায়রে কপাল !

ছোটো স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়া পরী কাঁদিয়া ফেলিল।

ক্ষেন্তি পিছু পিছু আসিয়া বলিল, কাঁদছ কেন ? সয়ে যাবে।

বলিয়া সে পরীর বিছানাতে বসিল।

শোনো বলি। কলকাতার সে বাড়িতে আমি যখন কপাল পুড়িয়ে এলাম—

পরী বাধা দিয়া বলিল, থাক। তুমি যাও।

শোনোই না। আমি যখন কপাল পুড়িয়ে এলাম, বাড়ির রাজা আমাকে বললে, নীচেরটা স্যাঁতসেঁতে তুই ওপরেই থাক। তোর মার সহ্য হয়ে গেছে কিছু হবে না, তোর অসুখ করবে। আমি—

ক্ষেন্তির হঠাৎ খেয়াল হইল, পরী সখী নয়, ওকে শুনাইয়া বুক হালকা হইবে না।

হঠাৎ গম্ভীর হইয়া ঢোঁক গিলিয়া সে বলিল, ব্যাপার বুঝে আমি রাজি হলাম না। নীচে মার কাছেই রইলাম।

পরী শুইয়া পড়িল। আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়া বলিল, আমার জ্বর আসছে তুমি যাও ভাই।

একদিন হেমলতা জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁরে, ভুবনের কোনো খোঁজ করলি না ?

বনমালী বলিল, আপদ গেছে, যাক।

ঠিক সেই সময় মাথার উপর দিয়া একটা এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সেটা সুন্দরবনের উপরে পৌঁছিয়া গেল, মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা যেখানে আশ্রয় নিয়াছে।